রানীসাহেবা

বিমল মিত্র



ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি—১২

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ, ১৩৬১
দ্বিতীয় সংস্করণ
অগ্রহায়ণ, ১৩৬১
প্রকাশকঃ মলয়েন্দ্রকুমার সেন
ক্যালকাটা পাবলিসার্স
১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২
মুদ্রকঃ গোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
৪৭ গণেশচন্দ্র এভিনু্য,
কলিকাতা
বাঁধাইঃ ওরিয়েণ্ট বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
প্রচ্ছদশিল্পীঃ বাণীকুমার মজুমদার
প্রচ্ছদ মুদ্রণঃ নিউ প্রাইমা প্রেস

॥ দাম আড়াই টাকা ॥

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত কানাইলাল সরকার

করকমলেষু

॥ লেখকের অন্যান্য বই ॥

দিনের পর দিন
ছাই
সাহেব বিবি গোলাম
পুতুল দিদি
মৃত্যুহীন প্রাণ
কন্যাপক্ষ

সূচী

রাণীসাহেবা ৯, বসন্তী ২৮, নায়িকার জন্ম ৭৫, আকাশে শ্রাবণ ৬৩, আশুকাকা ৭৬, নিমন্ত্রিত ইন্দ্রনাথ ৮৯, লিলি পালিত ৯৯, অসতী ১১৫, আমীর ও উর্বশী ১৩৫

রাণীসাহেবা

মানুষের সংসারে কত চরিত্রই যে দেখলাম। এক-একটা মানুষ দেখেছি, আর একটা মহাদেশ আবিষ্কারের আনন্দ পেয়েছি। পৃথিবীতে সব মানুষ সব কিছু পায় না, সেজন্যে আমার অভাববোধ হয়ত আছে, কিন্তু অভিযোগ নেই। আমি গোয়াবাগানের মেসে সুধা সেনকে দেখেছি, বিলাসপুরের বাণী-বিদ্যায়তনে প্রমীলা সরকারকে দেখেছি, দেখেছি রাণী দে, বুনু রায়, লিলি পালিতকে। দেখেছি মিসেস সুজাতা স্বামীনাথনকে জব্বলপুরের শিয়ালকোট লজ-এ। আরো দেখেছি 'নীলনেশা'র রায়সাহেবকে, প্রফেসর-পত্নী কণিকা দেবীকে। আর, আরো দেখেছি সবজীবাগানে সুরুচি আর সদানন্দবাবুকে। ওদের সকলকে নিয়ে গল্প উপন্যাস লিখেছি—কিন্তু আরো কতজনকে নিয়ে যে আমার আজো লেখা হয়নি তাও তো বলে শেষ করা যায় না।

এই যেমন আজকের রাণীসাহেবা।

রাণীসাহেবাকে আজ এতদিন পরে আবার বেহারের এই দুর্গম পল্লীতে দেখতে এলাম। দীর্ঘ পঁচিশ তিরিশ বছরের সম্পর্ক। মনে হলো, ভবিষ্যতে যদি কাউকে নিয়ে গল্প লিখি তো সে এই রাণীসাহেবাকে নিয়েই লেখা উচিত।

সেই পাঁচশো মাইল দূর থেকে আমরা এসেছি। লাহেড়িয়া সরাইতে নেমে মোটরে তিরিশ মাইলের রাস্তা। মৃণালিনীর বিয়ে - রাণীসাহেবার একমাত্র মেয়ে মৃণালিনী।

অনেকদিন পরে যখন হবেনা-হবেনা করে প্রথম সন্তান হলো, গোকুল জিজ্ঞেস করেছিল—কী নাম রাখা যায় রে মেয়ের?

তখন সংস্কৃত সাহিত্য নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছি। নাম দিয়েছিলাম—শকুন্তলা।

কিন্তু সে-নাম টেঁকেনি। শেষ পর্যন্ত মা'র ইচ্ছের কাছে বাবার ইচ্ছেকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। সেই নামের ব্যাপারেই শুধু নয়। গোকুল যখন নামে-প্রতিভায়-প্রতিষ্ঠায় বড় হলো, রায়সাহেব হলো, তখনও কঠোর হাতে পেছন থেকে যে-মানুষটি শাসন করতো, সে মৃণালিনীর বাবা নয়, তার মা—আজকের এই রাণীসাহেবা। কত সম্বর্ধনা-সভায় উঠে বক্তৃতায় বলেছে

গোকুল—আমার উন্নতির মূলে রয়েছেন আমার স্ত্রী—তিনি আমায় দিয়েছেন তাঁর একনিষ্ঠ ভালবাসা, তাঁর সেবা, তাঁর যত্ন, তাঁর ঐকান্তিকতা—

সত্যি সত্যি বিয়ের আগে কী ছিল গোকুল আর পরে কী-ই না হয়েছিল। এ তো যুদ্ধের হিড়িকে ফুলে-ফেঁপে বড়লোক হওয়া নয়, ধাপে ধাপে কেবল উঠেছে গোকুল, শুধু আরো বড় ধাপে ওঠবার জন্যেই। চেম্বার অব কমার্স, এম এল এ, সেনেট-সভা, স্বদেশ-বিদেশ সমস্ত জুড়ে মরবার শেষ দিনটি পর্যন্ত কেবল সাফল্য আর সাফল্য। যাতে হাত দিয়েছে, তাতেই লাভ। সমস্তর মূলে নাকি গোকুলের স্ত্রী। ওর স্ত্রীর ভালাবাসা।

আমি শুনতাম। কিন্তু ভেবে পেতাম না, শুনে হাসবো না কাঁদবো!

কিন্তু সে-সব কথা এখন থাক।

কলকাতা থেকে পাঁচশো মাইল দূরে বেহারের এই দুর্গম পল্লীতে রাণী সাহেবার মেয়ের বিয়েতে এসে যদি সেদিনকার সব কথা, সব ইতিহাস মনে পড়ে যায়, তো মনকে দোষ দিই কী করে।

বিরাট বাড়ি। ঠিক বাড়ি নয় প্রাসাদই বটে। শুনলাম, সাতানব্বই বিঘের ওপর বাড়িখানা। বিয়ে কাল, কিন্তু সকাল থেকে যে-ব্যাপার চলেছে তাতে কে বলবে দেখে যে, বিয়ে আজকে নয়। আমরা যাঁরা অতিথি, তাঁদের আদর আপ্যায়নের আয়োজন চূড়ান্ত। দশখানা গ্রামের হাজার হাজার প্রজা সকাল থেকে পাতা পেড়েছে। লাড্ডু, পেড়া, গুলজামুন, বালুসাই, পুরী, বরফির ছড়াছড়ি চারিদিকে। মুন্সীজী এক-একবার এসে খবর নিয়ে যায় সকলের কোন অসুবিধে হচ্ছে কি না।

পরের দিন কখন বর এল, কখন বিয়ে হলো, ভিড়ের মধ্যে কিছু দেখাই গেল না। তবু দেখবার চেষ্টা করেছিলাম বৈ কি। রায়সাহেব গোকুল মিত্তিরের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী, তার স্বামীকে দেখবার ইচ্ছে ছিলই। কিন্তু বৃথা চেষ্টা।

বিয়ের পরদিন মুন্সীজীকে বললাম—একবার রাণীসাহেবার সঙ্গে দেখা করতে পারা যায় না?

মুন্সী হয়ত প্রথমে অবাক হয়েছিল। কিন্তু চেষ্টা করবে বলে শেষ পর্যন্ত অন্দরমহলে খবর পাঠালে। খবর যেতে-আসতে তাও প্রায় এক ঘণ্টা লাগলো। সত্যিই তো বিয়ে-বাড়ি—সবাই ব্যস্ত। এখন একজন বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা করতে কারই-বা অবসর হবে। কিন্তু তা নয়। মুন্সীজী বললে—না হুজুর, রাণীসাহেবার কড়া হুকুম আছে, পুরুষ মানুষ কেউ যেন অন্দরমহলে না ঢোকে।

মুন্সীজীর কথা যে বর্ণে বর্ণে সত্যি, তা পরেই টের পেলাম। সদর আর অন্দরের মাঝামাঝি একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে আমাকে বসালো। দক্ষিণ-

দিকে একটি মাত্র দরজা। দরজার ওপাশেই অন্দরের সীমানা। দরজায় পর্দা খাটানো। ঘোমটা দিয়ে একজন ঝি এসে দাঁড়ালো দু'ঘরের মাঝখানে।

মুন্সীজী আমায় ইঙ্গিত করলে—রাণীসাহেবা এসেছেন—যা বলবার শিগ্‌গির বলে নিন—বড় ব্যস্ত উনি—

এমন অবস্থার জন্যে ঠিক প্রস্তুত ছিলাম না। এমন দিনও গেছে, যেদিন রাণীসাহেবার সামনাসামনি বসে কথা বলেছি। আজ হঠাৎ এতদিন পরে বাঙলা দেশ ছেড়ে এসে বেহারের এই জমিদারীতে বসে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েসে বিগত স্বামীর বৃদ্ধ বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে এই সঙ্কোচ, এই আয়োজন, এ আমার পছন্দ হলো না। এমন জানলে আমিই কি এমন প্রস্তাব করতাম! নিজেকে যেন অপমানিত মনে করলাম। রায়সাহেব গোকুল মিত্তিরের বিধবা স্ত্রীর অগাধ সম্পত্তি থাকতে পারে—কিন্তু আমরা দুজনে এক সময় তো ঘনিষ্ঠ বন্ধুই ছিলাম। সে-বন্ধুত্বের দাবীও কি কিছুই নয়!

মৃণালিনীর বিয়েতে দেবার জন্যে কলকাতা থেকে একটা শাড়ি এনেছিলাম। সেখানা মুন্সীজীর হাতে দিয়ে বললাম—না, আমার কিছু কথা বলবার নেই—এইটে রাণীসাহেবাকে দিয়ে দিও—

বলে আর কালক্ষেপ না করে সোজা বাইরে চলে এলাম। তখনি সমস্ত বন্দোবস্ত করে একটা টাঙ্গা ডাকিয়ে নিয়ে স্টেশনে রওনা দিলাম। আজ অবশ্য গোকুল বেঁচে থাকলে এমন ঘটনা ঘটতো না। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেন যে এখানে কিসের টানে এত দূরদেশে এসেছিলাম, তাই ভেবেই নিজের মনকে ধিক্কার দিলাম। কে রাণীসাহেবা! কোথাকার রাণী! আমার কে তারা? মনে পড়তে লাগলো গোকুলের কথাগুলো। অর্থের অভাব গোকুলের কখনও অবশ্য হয়নি। বিয়ের পর থেকেই বৃহস্পতি তুঙ্গী হয়েছিল ওর জীবনে। ধনে, মানে, প্রতিষ্ঠায় বন্ধুদের মধ্যে আর কে অমন সাফল্যের সপ্তম স্বর্গে উঠতে পেরেছিল। কিন্তু অমন হতভাগ্যও আমি জীবনে তো কম দেখেছি!

কোন মহিলা সভার সম্পাদিকা একবার চাঁদার খাতা নিয়ে এসেছিলেন গোকুলের বাড়িতে। ধনবান গোকুলের কৃপাপ্রার্থী তারা। বাইরের ঘরে চেয়ারে বসিয়ে গোকুল কথা বলছিল, এমন সময় ভেতরের পরদা ঠেলে এই রাণীসাহেবা বেরিয়ে এসেছিলেন।

ঘরে ঢুকে বলেছিলেন—বের করে দাও এঁকে—এখনি বের করে দাও—

গোকুল যতখানি স্তম্ভিত, তার চেয়ে বেশি স্তম্ভিত মহিলা-সভার সম্পাদিকা।

রাণীসাহেবা বলেছিলেন—তুমি যদি বের করে না দাও, আমারও বের করে দেবার অধিকার আছে—দারোয়ান—দারোয়ান—

চীৎকার করে দারোয়ানকে ডাকতে লাগলেন রাণীসাহেবা। ঘরের মধ্যে আরো দুজন ভদ্রলোক. একজন টাইপিস্ট, আশেপাশে চাকর, দারোয়ান, ঝি, ঠাকুর। কারোর দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। কলকাতার ধনীসমাজে তখন সবেমাত্র প্রভাব-প্রতিপত্তি শুরু হয়েছে গোকুলের। বৌবাজারের ছোট দোতালা বাড়িটা ছেড়ে লেক রোডের চারতলা বাড়িটা সবে তুলেছে। হাওড়ায় দু' দুটো জুট্ মিল চলছে আবার সেই সঙ্গে গিরিডির একটা অভ্রখনিও কিনেছে। ওদিকে কাউন্সিলের ইলেক্শনে দাঁড়াবে কিনা ভাবছে—অবস্থাটা এইরকম। মোটকথা সেদিনকার সেই ঘটনাটা যেমন অবিশ্বাস্য তেমনি অপমানজনক। কোনও সূত্রে প্রকাশ্যে বাইরের ঘরে তাঁর আসবার কথাও নয়।

দারোয়ান এখনি এসে যাবে! কাণ্ডজ্ঞানহীন স্ত্রীর আচরণে হতবাকও বটে, ক্ষুব্ধও বটে। গোকুল উঠে দাঁড়াল। কিন্তু কাকে সে নিবারণ করবে! স্ত্রীর মুখের ওপর কথা বলার সাহস আর যার থাক গোকুলের নেই।

সম্পাদিকা পর্দানশীনা নন। দশ রকম মানুষের সঙ্গে মেলামেশার অভিজ্ঞতা আছে. ব্যাপারটা বুঝলেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—আচ্ছা, আমি এখন উঠি তা হলে স্যার—একদিন সময়মত অফিসে দেখা করবো বরং—

বাঘের মতন লাফিয়ে উঠলেন স্ত্রী।

— তা তো করবেনই—কিন্তু খবরদার বলছি, ও হাসি আমি চিনি—হাসতে হাসতে ঘাড় নেড়ে এলোখোঁপা দুলিয়ে পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলতে খুব ভাল লাগে তা-ও জানি—আরো ভালো লাগে যদি সে-মানুষটি দেখতে ভালো হয়, লক্ষ টাকার মালিক হয়—চাঁদা চাইবার নাম করে.... ছি ছি পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে সব দেখেছি......

—আঃ কী হচ্ছে মিণ্টু—ক্ষীণ প্রতিবাদ করতে চেষ্টা করে গোকুল।

—তুমি থামো দিকি—আমি না থাকলে কবে তুমি এদের পাল্লায় পড়ে মারা যেতে—ছি ছি তোমাকে আমি দোষ দিই না—কিন্তু সংসারে এমন সরল হলে কি করে চলবে—

মহিলাটি তখন এক ফাঁকে সরে পড়েছেন।

কিন্তু পরদিন থেকে ব্যবস্থা হলো অন্যরকম। গোকুলের ড্রাইভারের পাশে দিবারাত্র আর একজনকে দেখা যেতে লাগলো।

গোকুল মোটরে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলে—তোর পাশে ও-কে রে যজ্ঞেশ্বর!

যজ্ঞেশ্বর পুরোনো ড্রাইভার। বললে—আজ্ঞে সৌরভীর বড় ভাই—গোকুলকে মোটরে ওঠবার সময়ে নমস্কার করেছিল একবার। মনে

পড়ল এখন। লোকটা আর একবার পেছন ফিরে নমস্কার করলে। বললে—আমার নাম হরিশ স্যার, সৌরভী আমার ছোট বোন হয়—

স্ত্রীর ডান হাত সৌরভী। সেই সৌরভীর বড় ভাই।

অফিসে ঢুকে বসেছে গোকুল। কাজ করছে। মাঝে মাঝে অকারণে হরিশ ঘরের ভেতরে উঁকি মারে।

—কিছু দরকার আছে?

উত্তর দেয় না হরিশ। টুপ্ করে মাথাটা সরিয়ে নেয়। এক-একদিন অফিস থেকে বেরিয়ে ইচ্ছে হয় একবার সিনেমায় যায়। কিন্তু স্ত্রীর কড়া বারণ আছে ওতে। সিনেমা মানেই তো ওই। দেয়ালে প্ল্যাকার্ডগুলো দেখ না। বাইরে যার ওই, ভেতরে যা আছে তা কল্পনা করেই নাও। আগে না বলে-কয়ে কয়েকদিন ঢুকেছে ভেতরে। মাথাটা যেন ঠাণ্ডা হয়ে যায় বেশ। কিন্তু হরিশ আসার পর থেকে কেমন যেন সঙ্কোচ হয় গোকুলের।

স্ত্রী বলেন—কেন, গাড়িতে হরিশ থাকা তো ভাল, রাস্তায় ঘাটে কতরকম বিপদ-আপদ আছে, দেশে ধর্মঘট তো রোজ লেগেই রয়েছে—আর তা ছাড়া তোমার সুবিধের জন্যেই তো রাখা—

যত কাজই থাক রাত আটটার পর গোকুলের আর বাইরে থাকবার হুকুম নেই। একেবারে অন্দরমহলে গিয়ে ঢুকতে হবে। সে-নিয়ম যেমন কঠোর তেমনি অমোঘ।

স্ত্রী বলেছেন—রাত্তিরের বেলায় যারা ব্যবসা চালায় তাদের বলে বেশ্যা—অমন পয়সার দরকার নেই আমার—একবেলা খাবো, ভিক্ষে করে পেট চালাবো, তাও ভালো—তবু—

গোকুল বলেছে—না ভাই, ও-সব জিনিস তর্ক করবার নয়—ও যা চায় না তেমন কাজ না ই বা করলাম—

স্ত্রীর মতেই চলেছে গোকুল সারাজীবন, স্ত্রীর পরামর্শ মতই কাজ করেছে। একটা পয়সা কাউকে চাঁদা বা ধার দিতে গেলে স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে তবে দিয়েছে। বাড়িতে এসে সারাদিন কোথায় কোথায় গিয়েছে, কার-কার সঙ্গে দেখা করেছে বা দেখা হয়েছে সমস্ত সবিস্তারে বলেছে স্ত্রীকে। টাকা, পয়সা, আধলা, পাইটি পর্যন্ত স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে তবে ছাড়া পেয়েছে।

একবার খুব অসহ্য হওয়াতে ডাক্তার সেনগুপ্তের কাছেও গিয়েছিল।

গোকুল সমস্ত খুলেই বলেছিল—দেখুন আমার স্ত্রী আমাকে বড় সন্দেহ করেন—সন্দেহ মানে তিনি মনে করেন আমাকে বিপথে নিয়ে যাবার জন্যে বিশ্বসংসারের সমস্ত নারী জাত বুঝি উন্মুখ হয়ে আছে—

আমার মত সুপুরুষ কলকাতা শহরে আর দ্বিতীয়টি নেই—এ-রোগের কী চিকিৎসা—

—ছেলেপুলে হয়েছে আপনার? ডাক্তার জিজ্ঞেস করেছিলেন।

—না—

—ছেলেপুলে হলেই সেরে যাবে—কিছু ভাববেন না—যাতে ছেলে হয় বরং সেই চিকিৎসা করান—

সে-চিকিৎসা করাতে হয়নি শেষ পর্যন্ত। কারণ কয়েক বছর পরেই মেয়ে হলো গোকুলের।

মেয়ে হবার পর একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম—এখন কেমন চলছে গোকুল—ব্যাধি কমেছে?

—না ভাই, আরো বেড়েছে—গোকুল ম্রিয়মাণ হয়ে জবাব দিলে।

—সে কি?

আমার কিন্তু বরাবর মনে হতো গোকুল হয়ত ঠিক সত্যি কথা বলে না। কোথায় যেন একটা গর্ববোধ আছে মনের ভেতরে। অন্যের স্ত্রীরা যেন ওর স্ত্রীর তুলনায় কম সতীসাধ্বী! কম পতিপ্রাণা! ওর মনে হতো ওর উন্নতির মূলে আছে ওর স্ত্রীর একনিষ্ঠতা। বুঝি ওর স্ত্রীর কল্যাণেই ওর সম্পত্তিপুরের একটা সুগার মিল, হাওড়ার দুটো জুট মিল, ওর রায়সাহেব উপাধি, ওর কলকাতার সাতখানা বাড়ি, লাহেড়িয়াসরাই-এর জমিদারী—সব!

যা হোক—সেই গোকুল মিত্তির—লেট রায়সাহেব গোকুল মিত্তিরের মেয়ে মৃণালিনীর বিয়ের নিমন্ত্রণে 'না' বলতে পারিনি। পুরোন বন্ধুত্বের টানে পাঁচশো মাইল দূর থেকে এই বয়সে এই পল্লীগ্রামে এসেছি। কিন্তু স্টেশনের ওয়েটিংরুমের মধ্যে চুপচাপ বসে বসে মনে হলো আমি না এলেই বা কে কী মনে করতো! কার কী এমন ক্ষতি হতো!

এখনো ট্রেন আসতে দু' ঘণ্টা দেরি।

হঠাৎ মুন্সীজী শশব্যস্তে ঘরে ঢুকলো!

বললে—রাণীসাহেবা পাঠিয়ে দিলেন আমাকে—আপনি চলে যাবেন না—এই চিঠিটা রাণীসাহেবা পাঠিয়েছেন আমার হাতে—

মনে হলো বলি—রাণীসাহেবা তোমাদের রাণীসাহেবা, আমার কে! কিন্তু নিজেকে শান্ত করে চিঠিটা পড়লাম। অনেক অনুনয় করে লিখেছেন—'আপনি এমন রাগ করে চলে গেলে মিনুর অকল্যাণ হবে। বর কনে চলে যায়নি এখনও। অতিথি দেবতার সমান। আপনার সঙ্গে আমারও কিছু কথা ছিল—বর কনে চলে যাবার পর বলবো ইচ্ছে ছিল।

এ-সুযোগ হয়ত আর পাবো না—দয়া করে ফিরে আসবেন—আমার মান রাখবেন—'

রাণীসাহেবার মোটরে করে শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যিই আবার ফিরে আসতে হলো।

বিদায়ের সময় ভালো করে বরকে দেখলাম। শুনলাম মতিহারীর লোক। ওখানেই ওদের জমিদারী। রাণীসাহেবার চেয়েও বড় জমিদার ওরা। ছেলের বয়েস যেন মৃণালিনীর চেয়ে কমই মনে হলো। বেহারে তিন-চার পুরুষের বাস। এখানে থাকতে থাকতে চেহারায় পুরোপুরি বেহারী হয়ে গেছে। পাশে মৃণালিনীর বিরাট ঘোমটা, তা-ও যেন কেমন অবাক লাগলো। 'সুনীতি-শিক্ষা-সদন' থেকে আই-এ পাশ করেনি বটে কিন্তু কিছুদিন তো সেকেন্ড ইয়ার ক্লাশ করেছিল। সেই মেয়ে, যাকে নিয়ে অত কান্ড, সে-ই বা অমন অতখানি ঘোমটা কেমন করে দিতে পারলো!

বর কনে চলে গেল। বিয়ের উৎসব কিন্তু তখনও এতটুকু কমেনি। গ্রামের হাজার হাজার লোক নাকি ক'দিন ধরে এমনি খাওয়া-দাওয়া করবে। রাণীসাহেবার একমাত্র মেয়ের বিয়ে, তাদের হয়ত এই শেষ উৎসব।

সন্ধ্যেবেলা রাণীসাহেবা লিখে পাঠালেন—আজ রাত্রিটা আমায় ক্ষমা করবেন—আমার মন বড় খারাপ, কাল দিনের বেলার ট্রেনে যাবার বন্দোবস্ত করে দেব এবং যদি সকালে আপনার অসুবিধে না হয়—সেই সময়ে সাক্ষাৎ হবে।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে অনেক পুরোন কথা মনে আসতে লাগলো।

পুরোন বলে পুরোন!

সে-প্রায় তিরিশ বছর আগের ঘটনা। শুধু ঘটনা বললে ভুল বলা হবে! আমার জীবনে সে এক দুর্ঘটনা বটে। আর রাণীসাহেবা! কিন্তু তখন তো তিনি রাণীসাহেবা হননি—তখন তিনি জামসেদপুরের আরতি রায়। সেকেন্ড ইয়ারের আর্টসের ছাত্রী।

গোকুল মিত্তিরের বিয়ের খবরটাও বন্ধুমহলে সেই সময়ে হঠাৎ শোনা গেল।

বরযাত্রীরা কলকাতা থেকে দল বেঁধে বরের সঙ্গে যাবে টাটানগরে।

আর আমি? আমি তখন কাকার বারো নম্বর সি-রোডের কোয়ার্টারে সামনের ঘরটায় ছুটি কাটাতে গেছি। হঠাৎ গোকুলের চিঠি পেলাম—

তোর সামনের বাড়িতে বিয়ে করতে যাচ্ছি—তৈরি থাকিস—সদলবলে পরশু বিকেলবেলা হাজির হবো—

তখন নজরে পড়লো, সত্যি সত্যি সামনের ষোল নম্বরের বাগানে ম্যারাপ বাঁধা হচ্ছে বটে। সামনের বাড়িতে যেন উৎসবের ছোঁয়াচ লেগেছে এরি মধ্যে। সামনে দু' তিনটে মোটর, লোকজন।

মাঘ মাস। প্রচণ্ড শীত পড়েছে। সেদিনই একলা একলা অনেক রাত পর্যন্ত একখানা বই নিয়ে পড়ছিলাম। কাকা কাকীমা সবাই ভিতরে ঘুমিয়ে পড়েছে। হঠাৎ অত্যন্ত মৃদুস্বরে দরজায় একটা টোকা পড়ল। তারপর আর একবার। উঠে র‍্যাপারটা ভালো করে গায়ে দিয়ে দরজাটা খুলে পর্দাটা সরাতেই বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেছি !

সেই শীতের ঠাণ্ডা রাত—চারিদিকে অন্ধকার—মনে হলো মানুষ নয় যেন পরী। বাইরের কুয়াশা যেন পরী হয়ে ঘরের মধ্যে আগুন পোয়াতে এসেছে।

মেয়েটির কত বয়স হবে। আঠারো উনিশ। আমার হাঁটুর ওপর মুখ রেখে সে কী অঝোরে কান্না। এমন ঘটনায় বিভ্রান্ত না হয়ে কি উপায় আছে ?

বললাম—কে আপনি—কী চান—

দু' কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে অনেকবার প্রশ্ন করলাম। আমার প্রশ্নে কান্না তার আরো করুণ হয়ে উঠলো। কিছুতেই বুঝতে পারলাম না কী চায়, কেন এসেছে সে এত রাত্রে।

পঁচিশ তিরিশ বছর আগেকার ঘটনা। সব কথা মনে নেই আজ।

তবু কাঁদতে কাঁদতে সে-রাত্রে মেয়েটি যা বলেছিল তা যেমন অস্বাভাবিক তেমনি কৌতুকপ্রদ। তেরো নম্বর সি-রোডের বাড়িতে যে ছেলেটি থাকে —তাকে আমায় তখুনি ডেকে দিতে হবে। তার নাম নাকি বিকাশ। বাড়ির সামনে যে-ঘর, তার পুব দিকের জানালায় গিয়ে ডাকলেই সে আসবে। তার সঙ্গে সেই রাত্রে দেখা হওয়া মেয়েটির নাকি বিশেষ দরকার।

মেয়েটি বললে—আমি গেলে কেউ দেখতে পাবে—আপনি দয়া করে একবার বিকাশকে ডেকে আনুন—জিজ্ঞেস করলে বলবেন, আরতি তাকে ডাকছে—আমি বিশেষ বিপদে পড়েছি—

আরতি বসলো আমারই বিছানায়।

আর আমি তার নির্দেশমত অগত্যা সেই শীতের মধ্যেই ডাকতে গেলাম। তেরো নম্বরের অজ্ঞাতকুলশীল বিকাশকে। সেদিন ভারি রহস্যময় মনে হয়েছিল এই ঘটনা। বিকাশ যখন এল, আরতির চোখে সে কী ব্যাকুল

ভয়ার্ত আবেদন। বিকাশকে ঘরে পৌঁছিয়ে দিয়ে আমার কী কর্তব্য ভাবছিলাম, মেয়েটি বললে—আপনি দয়া করে বাইরে একটু বসুন—একটু কষ্ট দেব আপনাকে—

আমার ঘরের বিছানায় ওদের দু'জনকে বসিয়ে আমি নির্বোধের মতন বাইরে চলে এসে বারান্দায় বেতের চেয়ারটায় বসলাম।

তারপর সেই শীতার্ত রাত কেমন করে কাটলো তা আজ আমার মনে থাকবার কথা নয়। শুধু এইটুকু মনে আছে যে, সমস্ত রাত ওদের ঘরের আলো জ্বলেছে আর আমি না-ঘুম-না-জাগরণে সেই বেতের চেয়ারে বসে পলে পলে শীতে জমে বরফ হয়ে গেছি। তারপর কখন কাকার ওয়াল-ক্লকটায় বারোটা বেজেছে, একটা বেজেছে, দুটো বেজেছে, তিনটেও বেজেছে—সব টের পেয়েছি। ঘরের ভেতরের টুকরো টুকরো কথা, কান্নার আভাস বাইরে ভেসে এসেছে। পাশের চেরি গাছটার পাতা থেকে টপ্ টপ্ করে শিশির ঝরে পড়েছে সারা রাত। আমার গায়ে শুধু একটা পুল-ওভার। জামসেদপুরের সেই কন্‌কনে ঠাণ্ডা শীতকে সে-পুল-ওভার কতটা আর আটকাতে পারে!

ভোর হবার আগে ওরা যখন বেরিয়ে যায়, আমার সঙ্গে কোন কথা বলা বা আমাকে ধন্যবাদ দেওয়ার প্রয়োজনও মনে করেনি। মনে আছে পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠতে আমার প্রায় বেলা নটা বেজে গিয়েছিল।

কিন্তু বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হওয়ার বুঝি তখনও আমার অনেক বাকি ছিল। বরযাত্রীর দলবল নিয়ে গোকুল এল বিয়ের দিন সকালে। কিন্তু বিয়ের আসরে বউ দেখতে গিয়ে আমার বাক্‌রোধ হয়ে এল।

আরতি রায়! সেই রাত্রে আমার ঘরে আসা সেই মেয়েটি!

গোকুল বোধ হয় বউ দেখে খুশীই হয়েছিল। বরযাত্রীর দলের সঙ্গে কলকাতায় চলে এলাম। কিন্তু নিজের বিবেকের সঙ্গে যে বিরোধ সমস্ত মনকে ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছিল—তা কেমন করে চেপে রেখেছি সারাজীবন, তা আমার অন্তরাত্মাই জানে।

বৌভাতের দিন বন্ধুরা এক একটা উপহার তুলে দিয়েছে নববধূর হাতে। কারোর দিকে মুখ তুলে চায়নি নববধূ। আমি কিন্তু আর একবার ভালো করে চেয়ে দেখলাম সেদিন সেই সুযোগে। মনে হলো ধুতির নরুন পাড়ের মত সাদা মুখে একটা বিষাদ, পাউডার আর স্নোর প্রান্তে আলতোভাবে ঝুলছে। সেই বিষাদটুকুই নববধূর সমস্ত অবয়বে একটা অভিনব মাধুর্য এনে দিয়েছে যেন। সেদিন মনে হয়েছিল—আমিই কি ভুল করেছি না ও শুধু আমার নিজস্ব একটা ভাষ্য—যার পেছনে যে-যুক্তি আছে তাও বুঝি আমার মনগড়া। অনেকবার মনের গোপন

সংবাদটা বিশ্বস্ত বন্ধুদের বলি-বলি করেও বলা হয়নি। গোকুলকে বলা তো দূরের কথা।

পরে অনেক দিন গোকুল বলেছে—ভাবি ইনটেলিজেন্ট, জানলি—কিন্তু তোর ওপর ওর খুব রাগ—কেন বল্‌তো?

বলতাম—ব্যাচিলরদের ওপর বন্ধুর বউদের ওরকম একটু রাগ থাকে।

তারপর আস্তে আস্তে গোকুল বড়লোক হলো। অল্পবিত্ত থেকে মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত থেকে ধনী—ধনী থেকে লক্ষপতি! সে-ইতিহাস এখানে অবান্তর। কখনও ক্কচিৎ কদাচিৎ দেখা হতো—আবার কখনও ঘনঘন। অতবড় ব্যবসাদার, নানান কাজের মানুষ। কিন্তু বরাবর দেখে এসেছি রাত আটটার পব কখনও বাইরে থাকেনি।

বলেছে—না ভাই ও সব তর্ক করবার জিনিস নয়—ও যা চায় না তেমন কাজ নাই বা করলাম—

সম্বর্ধনা-সভায় উঠে দাঁড়িযে গোকুল বলেছে—আমার এই উন্নতি—যার জন্যে আপনারা আমাকে সম্মান দিচ্ছেন, সে-সম্মান আমাব প্রাপ্য নয়, তার অনেকখানিই প্রাপ্য আমার স্ত্রীর—আমি অকুণ্ঠভাবে স্বীকার কবছি এমন স্ত্রী, এমন স্ত্রীর ঐকান্তিক নিষ্ঠা ভালবাসা সেবা ও যত্ন না পেলে আমি জীবনে কিছুই করতে. ইত্যাদি .

সংবাদপত্রে সে-রিপোর্ট সবিস্তাবে ছাপা হয়েছে। আমি পড়েছি। আমরা সবাই পড়েছি। কিন্তু নিজের কৌতূহল আর সেই রাত্রের গোপন ঘটনাটির কথা মারণমন্ত্রের মত বুকে পুষে রেখে নিজের মনেই ক্ষতবিক্ষত হয়েছি। বহুদিন পরে একবার টাটানগরে গিয়েছিলাম। সেই অজ্ঞাত-কুলশীল বিকাশের খোঁজও করেছিলাম। কাকার বাড়ি সি রোড থেকে তখন এফ রোডে বদলি হয়েছে। কিন্তু জীবনে অনেক জিনিস হারিয়ে যাওয়ার মত বিকাশও সেদিন হয়তো সৌভাগ্যক্রমে হারিয়েই গিয়েছিল এবং অনেকদিন পরে যখন দেখা হলো...কিন্তু সে কথা এখন থাক, নইলে রাণীসাহেবাকে নিয়ে গল্প লেখবার প্রচেষ্টাই বা কেন!

এরপর গোকুল মিত্তির বৌবাজার থেকে লেক রোড, লেক রোড থেকে ভবানীপুর, ভবানীপুর থেকে থিয়েটার রোড-এ ধাপে ধাপে উঠে গেছে। সাধারণ লোক থেকে রায়সাহেব হয়েছে। দশজনের একজন ছিল, ক্রমে দশজনের শীর্ষে উঠেছে। বাইরে থেকে আমরা দেখেছি গোকুলকে। বাহবা দিয়েছি। কিন্তু গোকুল বরাবর বলেছে—না না আমি কিছু নয় ভাই—এর পেছনে আছেন মিসেস মিত্তির—আরতি—মিণ্টু—

আমরা যখনি আমাদের স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার কথা বলেছি.

গোকুল সাপ দেখার মত লাফিয়ে উঠে পালিয়ে গেছে। এ নিয়ে আমাদের মধ্যে হাসাহাসি হয়েছে—তামাসা হয়েছে।

আমার স্ত্রী বলেছে—কেন, হাসির কী আছে—ওই তো ভালো—তোমাদের যেমন মেয়েমানুষ দেখলেই জিব দিয়ে নাল পড়ে!

চাঁদা চেয়ে বা ধার চেয়ে কখনও কেউ হতাশ হয়নি গোকুল মিত্তিরের কাছে। তবু মহিলা-সমিতি, গার্ল স্কুল কিম্বা দুঃস্থা বিধবা—এসব ব্যাপারে একটি পয়সা কখনও দেয়নি গোকুল এক আমাদের 'সুনীতি-শিক্ষা-সদন' ছাড়া। গোকুল বলতো—কী করবো, আরতির আপত্তি যে—

গোকুলের উন্নতির সংগে আমি যদিও বরাবর জড়িত ছিলাম—কিন্তু ওর চরিত্রের ওই দিকটার কথা মনে হতেই কেমন যেন করুণার চোখে দেখতাম ওকে। মনে হতো ইচ্ছে করলেই এক দণ্ডে গোকুলের জীবন বরবাদ করে দিতে পারি। ও হয়ত আত্মহত্যা করবে শুনে। কিন্তু আবার এক একবার মনে হতো হয়ত আমারই ভুল। আমার মনের কিম্বা চোখের ভুল। মনে হতো, সেদিন সেই শীতের রাত্রে বারো নম্বর সি-রোডের সামনের ঘরটার ঘটনা শুধু নিছক বিভ্রম মাত্র—আর কিছু নয়। আসলে গোকুলের ক্রম-উন্নতিব সংগে সংগে নিজের কৌতূহলের মাত্রাটাও দ্বিগুণ ত্রিগুণ চতুর্গুণ হয়ে বেড়েই চলেছিল।

এর পরের ঘটনা আরতি রায়কে নিয়ে নয়। আরতি তখনও রাণীসাহেবা হননি। তখন কেবল মিসেস মিত্র। প্রচুব প্রতিষ্ঠার শিখরে উঠে রায়সাহেব গোকুল মিত্তির যখন মারা গেল হঠাৎ, তখন কারবার নিজের হাতে নিলেন মিসেস মিত্র। স্বামীর জীবিত অবস্থায় যেমন আড়ালে থেকে স্বামীকে পরিচালনা করতেন, তেমনি আড়ালে থেকেই তখন থেকে ব্যবসা পরিচালনা করতে লাগলেন তিনি।

ঘটনাটা সেই সময়ের।

শকুন্তলা নয়—মৃণালিনী। মৃণালিনী ম্যাট্রিক পর্যন্ত পর্দা-স্কুলে পড়েছে। গোকুল মিত্তির ওই মৃণালিনীর স্কুলে যাওয়ার জন্যেই পাল্কী গাড়ি কিনেছিল। রবারের টায়ার লাগানো চাকা। জানালা দরজার খড়খড়ি বন্ধ। দুটো মোটা মোটা ওয়েলার ঘোড়া। দুটো মোটর থাকতেও কেন যে এই ব্যবস্থা জিজ্ঞেস করতে গোকুল বলেছিল—ও-সব কথা থাক্ ভাই—আরতি যখন চায় তখন ও নিয়ে আর—

তারপর ভর্তি হলো আমাদের 'সুনীতি-শিক্ষা-সদনে'। গীতা পাঠ, স্তোত্র পাঠ আর তার সংগে আই-এর কোর্স। এখানে ভর্তি হওয়ার পেছনে মিসেস মিত্রের নিশ্চয়ই সম্মতি ছিল। কারণ স্ত্রীর বিনা-পরামর্শে কোনও কাজ করবার পাত্র গোকুল নয়।

তখন গোকুল বেঁচে নেই। সমস্ত কাজ কারবারের কলকাঠি মিসেস মিত্রের হাতে। তখন সেই সময়ে একদিন আগুন জ্বলে উঠল।

সেদিন কলেজে নিয়মমত গেছি। ক্লাশ বসে গেছে। হঠাৎ মিসেস মিত্রের চিঠি নিয়ে এসে হাজির মিসেস মিত্রের দারোয়ান। পিওন-বুকে সই দিয়ে চিঠি নিলাম। চিঠি খুলে পড়তে গিয়ে মাথায় বজ্রাঘাত হলো।

সিল করা চিঠি। বিশেষ জরুরি এবং গোপনীয়।

টাইপ-করা তিন পৃষ্ঠা চিঠি। নিচেয় মিসেস মিত্রের সই।

পত্রের বিবরণে প্রকাশ—মিসেস মিত্রের মেয়ে মৃণালিনী নাকি প্রেমপত্র লিখেছে 'সুনীতি-শিক্ষা-সদনে'র ইংরেজীর প্রফেসার বিভূতি ঘোষালের কাছে এবং বিভূতি ঘোষাল সে-চিঠিব জবাবও দিয়েছে। এমন একখানা দু'খানা নয়, অনেকদিন ধরে অনেক চিঠিই লেখা হয়েছে। কিন্তু মিসেস মিত্তির এখন ধরে ফেলেছেন সমস্ত। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মৃণালিনীর কলেজে আসা বন্ধ করেছেন। শুধু তাই নয়, এখন জানতে চেয়েছেন বিভূতি ঘোষালের মত প্রফেসারকে কেন এখনি বরখাস্ত করা হবে না এবং বিশ্ব-বিদ্যালয় কেন 'সুনীতি-শিক্ষা-সদন'কে এখনি ভেঙে দেবে না। যেখানে মেয়েদের শিক্ষার নামে চরিত্রহীনতার এমন হাতেখড়ি দেওয়া হয় এবং যে-প্রতিষ্ঠানে অসচ্চরিত্র লম্পট শিক্ষকদের বেছে বেছে নিযুক্ত করা হয় মেয়েদের প্রলুব্ধ করবার জন্যে—সে-প্রতিষ্ঠান তুলে দেবার জন্যে কোনও আইন দেশে আছে কিনা—এবং না থাকলে সে-আইন এখনি কেন প্রবর্তন করা হবে না তাই জানতে চেয়েছেন। সুশিক্ষার নামে এইসব প্রতিষ্ঠানে ভদ্রঘরের যুবতী মেয়েদের যে এইভাবে অনাচার ও দুর্নীতি শিক্ষা দেওয়া হয় তা বহু লোক বহুদিন ধবেই সন্দেহ কবে আসছেন। কিন্তু ভদ্রবেশী গুন্ডাদেব কূটনীতিতে এতদিন সকলেব দৃষ্টি অন্ধ হয়ে ছিল। 'সুনীতি-শিক্ষা সদনে'র এই দৃষ্টান্ত এবার সকলকে. . ..ইত্যাদি. .

তিন পৃষ্ঠাব্যাপী অভিযোগ। শেষে লিখেছেন—দেশবাসী তথা বিশ্ব-বিদ্যালয় এর কোনও প্রতিবিধান না করলে তিনি আদালতের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হবেন।

এর একখানা নকল তিনি পাঠিয়েছেন ভাইস-চ্যান্সেলারের কাছে—আর একখানা চ্যান্সেলারের কাছে। এবং লিখেছেন যে, এর উত্তরের জন্যে তিনি পনেরো দিন অপেক্ষা করবেন—জবাব না পেলে তিনি অন্য ব্যবস্থা করতে বাধ্য হবেন।

গোকুল বেঁচে নেই। তবু গোকুল বেঁচে থাকলেও কোনও সুরাহা হতো বলে মনে হয় না। কারণ মিসেস মিত্রের কথাই শেষ কথা জানতাম।

কিন্তু চিঠিটা পড়ে হাসিও পেল। কারণ জামসেদপুরের সেই বারো নম্বর সি-রোডের ঘটনা তো নিছক কল্পনাও নয়।

কিন্তু চিঠিটা নিয়ে চুপ করে বসে থাকতেও পারলাম না। তখনি বিভূতি ঘোষালকে ডেকে পাঠালাম। ছোকরা মানুষ। ওদিকে বাঙালী ছাত্রদের মধ্যে রত্নও বলা যায়। অনেক দেখে শুনেই তাকে ভর্তি করে-ছিলাম। ইংরেজী, হিস্ট্রী আর ইকনমিক্‌সে এম-এ দিয়েছে। তিনটেতেই ফার্স্ট। চিরকাল এখানে চাকরি করবে না। আরো উন্নতি করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে।

সেদিন আমার প্রশ্নের উত্তরে যে কথা সে বলেছিল, তাতে তার বিশেষ কোনও দোষ আমি পাইনি।

এক কথায় সে বলতে চেয়েছিল—তারা দুজনেই দুজনকে ভালবাসে—

সেদিনকার মৃণালিনীকেও আজ মনে করতে চেষ্টা করলাম। খড়খড়ি বন্ধ পাল্কী গাড়ীর মধ্যে বন্দী হয়ে আসতো রোজ। মিসেস্‌ মিত্রের কড়া নজর আর কচোয়ান, চাকর, ঝি, দারোয়ানের নজরবন্দী হয়ে থেকে থেকে বোধ হয় কলেজের এলাকায় ঢুকেই সে জীবন ফিরে পেত। চটুল চলা আর কথা বলার ভঙ্গী থেকে বুঝতাম এখানেই একমাত্র সে বুঝি মুক্তির স্বাদ খুঁজে পেয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে তার লাফিয়ে লাফিয়ে দোতলায় ওঠা, ক্লাশের বাইরে দুর্দম ছোটাছুটি আর তারপর ঠিক বাড়ি যাবার আগে পাল্কীগাড়িটা যখন ঘেরা কলেজ কম্পাউণ্ডের ভেতরে এসে ঢুকতো তখন অকারণে বাড়ি যেতে দেরি করা আর যাবার আগে তার সেই চেহারা বিষাদ-মলিন হয়ে যাওয়া—সমস্তর যেন একটা মানে ছিল। আজ সেই মেয়েকেই দু'হাত নিচু ঘোমটা দেওয়া অবস্থায় তার চেয়ে কম বয়সী স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি যেতে দেখে তাই অত অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

যা হোক চিঠিটা পেয়েই মিসেস মিত্রের বাড়ি গেলাম তার সঙ্গে দেখা করতে। দেখাও হলো।

কিন্তু কে চিনতে পারবে সেদিনের সেই আরতি রায়কে। সাদা থান, তুষার ধবল গায়ের রং আর প্রচুর স্থূল মাংসপিণ্ডের তলায় জামসেদপুরের সে-মেয়েটি বুঝি কবে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

কিন্তু আশ্চর্য, যতক্ষণ ছিলেন সামনে বসে, একবারও আমার চোখে চোখ রাখলেন না। হয়ত ভেবেছিলেন যদি চোখের জাফ্‌রি দিয়ে সেই কুমারী আরতি রায় হঠাৎ এক ফাঁকে উঁকি মেরে দেখে ফেলে। কিম্বা যদি আমি চিনে ফেলি সেই আরতি রায়কে।

অনেকক্ষণ পরে ক্ষিপ্ত হয়ে বলেছিলেন—যাদের হাতে ছেলেমেয়ের চরিত্রগঠনের দায়িত্ব, তারাই যদি এমন করে তাদের সর্বনাশ করে তাহলে

বাপ-মায়ের মনে কতখানি দুঃখ হয় তা ভাবুন তো একবার—

আমার অবশ্য চুপ করে শোনবারই পালা। যিনি কথা বলছেন তিনি তখন আর বন্ধুপত্নী নন—রায়সাহেব গোকুল মিত্রের প্রচুর সম্পত্তি শালিনী বিধবা স্ত্রী।

বললেন—আপনারা ও-স্কুল উঠিয়ে দিন—যদি না দেন তবে জানবেন ও আমিই উঠিয়ে দেব—দেহের ধর্মনাশ আর মনের ধর্মনাশ. ও একই কথা—

তারপর পাশের দিকে চেয়ে ডাকলেন—প্রফুল্লবাবু—

গোকুলের পুরোন টাইপিস্ট প্রফুল্ল কাজ করছিল একপাশে। মিসেস মিত্রের ডাকে উঠে এল কাছে।

মিসেস মিত্র কপালের চুলগুলো ডান হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বললেন—একশো সাতের সি ফাইলটা আনুন তো একবার—

ফাইলটা আসতেই মিসেস মিত্র সেখানা খুললেন। বললেন—প্রফুল্লবাবু এই তেত্রিশের ফোলিওটা দেখে রাখুন—মাসে মাসে 'সুনীতি শিক্ষা-সদনে'র নামে যে পাঁচ হাজার টাকা করে চাঁদা বরাদ্দ আছে—আজ একটা চিঠি ড্রাফ্‌ট করে দেবেন ওটা ক্যান্‌সেল্‌ড্‌ হবে—আর ওদের ওখানে যে পঞ্চাশখানা পাখা দেওয়া আছে ওগুলোও ফেরৎ দেবার কথা লিখে দেবেন ওই সঙ্গে।

তারপর বাঁ পাশে দরজার দিকে চেয়ে ডাকলেন—সৌরভী—

সৌরভী এল।

বললেন—যজ্ঞেশ্বরকে একবার ডেকে দে তো।

যজ্ঞেশ্বর সামনে আসতেই বললেন—যজ্ঞেশ্বর শুনে রাখ, কাল যখন আপিসে যাবি, একবার খগেনবাবু, আমাদের একাউন্‌টেণ্টকে দেখা করতে বলবি তো—আমার সঙ্গে যেন একবার দেখা করেন বাড়িতে—বলবি বিশেষ দরকার—

তারপর সৌরভীর দিকে চেয়ে আবার বললেন—হ্যাঁরে মিনু বার্লি খেয়েছে, না এখনও......একবার জ্বরটা দেখলে হতো যে......আর যজ্ঞেশ্বর—শোন ইদিকে—

যজ্ঞেশ্বর ঝুঁকে পড়ে বললে—মা—

--একবার বড় ডাক্তারবাবুকে খবর দে তো—গাড়ি নিয়ে যা—নইলে দেরি হবে—বলবি এখনি যেন আসেন—প্রফুল্লবাবু, আপনি এ-মাসে ডাক্তারবাবুর দোকানের বিলগুলো এখনও দেন নি কেন—কাজে আপনাদের বড় গাফিলতি হয়—আমি যেদিকে না দেখবো......

দশটা কাজের মধ্যে মিসেস মিত্রকে যেন কেমন দিশেহারা দেখলাম। ঠিক যেন সামঞ্জস্য করতে পারছেন না জীবনের সঙ্গে। কোথায় কোন্ ফুটো দিয়ে বুঝি সব নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ আমার দিকে না চেয়েই আমাকে বললেন—ও আপনি এখনও বসে আছেন—আপনাকে চা আনিয়ে দিচ্ছি—সৌরভী চা নিয়ে আয় তো এক কাপ—

কী জানি হঠাৎ মিসেস মিত্রের চিঠিটা পেয়ে যেমন উদ্বিগ্ন হয়েছিলাম, সামনাসামনি ওঁকে প্রত্যক্ষ দেখে কেমন যেন ওঁর ওপর করুণা হলো। অর্ধমৃতের ওপর আঘাত করতে ইচ্ছে হলো না। মিসেস মিত্র কি সত্যি সত্যিই সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ!

সেদিন বাড়ির বাইরে এসে বাড়িটার দিকে ভালো করে চেয়ে দেখেছিলাম। চারদিকে উঁচু পাচিল দিয়ে ঘেরা জেলখানার মত। অমন রক্ষা-ব্যবস্থা কিসের জন্যে? জানালাগুলোর সামনে দেড় হাত জায়গার ব্যবধানে খড়খড়ির আবরণ দেওয়া। চন্দ্র-সূর্যও যেন ওখানে প্রবেশ করতে না পারে।

শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যি 'সুনীতি শিক্ষা-সদনের' মাসিক মোটা চাঁদাটা বন্ধ হয়ে গেল। গোকুল মিত্রের ধার দেওয়া পঞ্চাশখানা পাখা তাও একদিন ওদের লোক এসে খুলে নিয়ে গেল। তবু টিম্ টিম্ করে চলতে লাগলো প্রতিষ্ঠান। শেষে একদিন তাও বন্ধ হয়ে গেল।

তারপর একদিন কার কাছে যেন শুনেছিলাম যে মিসেস মিত্র মেয়েকে নিয়ে তাঁর লাহেড়িয়াসরাই-এর জমিদারীতে গিয়ে বাস করছেন। জনতা, কোলাহল, শহর, সভ্যতা থেকে দূরে পালিয়ে গিয়ে তিনি হয়ত আত্মরক্ষা করতেই চেয়েছিলেন। কুমারী জীবনে যে-দুর্বলতার প্রশ্রয় দিয়েছেন আরতি রায়, মিসেস মিত্র হয়ে তিনি সারাজীবন তার প্রায়শ্চিত্তই হয়ত করে গেলেন এবং নিজের কন্যার মধ্যে যাতে তাঁর কোন বিগত দুর্বলতার ছাপ না পড়ে, তার সেই শুভ প্রচেষ্টাই হয়ত তাঁকে তাঁর লাহেড়িয়াসরাই-এর দুর্গম বন্দী-নিবাসে আবদ্ধ করেছে। আমার ধারণা যে ভুল নয়, তা আজ মৃণালিনীর লম্বা ঘোমটা আর তার কমবয়েসী স্বামীকে দেখেই বুঝতে পারলাম।

মুন্সীজীও বলছিল—ওরা হুজুর বড় ভারি জমীন্দার—বনেদী বংশ ওদের—ওদের বংশের নিয়মই আলাদা, বউ শ্বশুরবাড়ি গেলে জীবনে আর কখনও বাপের বাড়ি আসতে পারবে না—এই যে আজ শ্বশুরবাড়ি ঢুকলো তো ঢুকলোই—আর বেরুবে না—বড় ভারি বনেদী জমীন্দার ওরা হুজুর—

সকাল বেলা নিয়মিত জলযোগের পর ডাক পড়লো।

মহলের পর মহল পেরিয়ে মুন্সীজী আজ একেবারে অন্দরমহলে নিয়ে

এসেছে। আজ আরতি রায়ও নয়, মিসেস মিত্রও নয়, আজ রাণীসাহেবা! সেই দুর্গম পল্লীপ্রাসাদের অভ্যন্তরে অন্দরমহলের একটি ঘর দেখলাম পরিপাটি করে সাজানো। চারপাশে কলকাতার সোফা কোউচ্‌। দেয়ালের সারা গায়ে গোকুলের নানা বয়সের নানা ভঙ্গীর ফোটো। দুটো মানুষ-সমান অয়েলপেণ্টিং। একটা গোকুলের আর একটা রাণীসাহেবার।

খানিক পরে পাথরের প্লেটে ফল আর মিষ্টি এল। আর তার পেছনে পেছনে এসে হাজির হলেন রাণীসাহেবা।

বহুদিন পরে দেখছি। বিচলিত হলাম। সত্যি এ-যেন অন্য মানুষ!

এসেই বললেন—ওটা খেতে আপত্তি করবেন না—ওটা প্রসাদ—আমার বিগ্রহ দেওকীনন্দনের।

তারপর সামনে বসলেন। আরো শুচি-শুভ্র আর তুষার-ধবল হয়েছে তাঁর অবয়ব। একটু আগেই স্নান সেরে পুজো সেরে আসছেন বোধ হয়। কপালে চন্দন-চর্চিত জোড়া ভৃগুপদরেখা। হাতে নাম-জপের থলি। ভেতরে আঙুলটা নিঃশব্দে নড়ছে। বুঝি ইষ্ট-নাম জপ করছেন।

বললেন—কেমন জামাই দেখলেন আমার—

তারপর খানিক থেমে বললেন—জানেন, মিনুর বিয়ের জন্যে আমার ভারি ভাবনা ছিল—আজ আমি সত্যিকারের স্বাধীন।

দেয়ালের অয়েল পেণ্টিংখানা দেখিয়ে বললেন—উনি বলতেন বটে যে আমিই নাকি ওঁর উন্নতির মূলে—কিন্তু উনি ছিলেন দেবতা, ওঁর স্পর্শ পেয়ে আমিই বরং ধন্য হয়ে গেছি—ওঁর ভালবাসা না পেলে কি আজ মিনুকে ঠিক নিজের মনের মতন করে মানুষ করতে পারতুম—নিজের পছন্দমত ঘরে বরে দিতে পারতুম—আজ উনিও নেই—মিনুও গেল—আপনারা সবাই এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাই কোনও বাধা এল না—তা ছাড়া—

আরো এমনি দু' একটা কথা হলো। আশ্চর্য হলাম। এ-যেন সে-মানুষ নন। আরতি রায়, মিসেস মিত্র আর আজকের এই রাণীসাহেবা, এরা যেন একজন নয়—তিনজনের তিনটি বিভিন্ন রূপ। অথচ পঁচিশ তিরিশ বছর ধরে ওঁকে চিনে এসেছি, তবু মনে হলো চেনার যেন আর শেষ নেই। এ-চেনার শেষ হবেও না। কবেকার কোন্‌ আরতি রায়—সে কি আজ রাণীসাহেবাকে দেখলে চিনতে পারবে? কিম্বা হয়ত রাণীসাহেবাও আজ আরতি রায়কে একেবারে সম্পূর্ণরূপে ভুলে গেছে। আরতি রায়কে দেখে রাণীসাহেবাও আজ বুঝি লজ্জায় অপমানে অধোবদন হয়ে থাকবে। নইলে এমন করে অসঙ্কোচে আমার চোখে চোখ রেখে কথাই বা কেমন করে বলতে পারছেন এই রাণীসাহেবা!

মামুলি বিদায় অভিনন্দনের পর চলে আসছিলাম।

দরজার বাইরে পা বাড়াতেই কানে এল—আর একবার শুনুন—

ফিরে দাঁড়ালাম। হাসি হাসি মুখ! হাসি দেখে কেমন যেন খট্‌কা লাগলো। হাসি তো কখনও দেখিনি ওঁর মুখে।

বললেন—একটা কথা আপনাকে জিগ্যেস করতুম—

—বলুন না, কী কথা?

—আপনি একদিন আমার মেয়ের নাম রাখতে চেয়েছিলেন শকুন্তলা—আমি রেখেছি মৃণালিনী—আপনার দেওয়া নামে আমার আপত্তি ছিল—কেন জানেন?

—না, কেন?

—আপনি আগে বলুন, কী মনে করে আপনি ওর নাম শকুন্তলা রেখেছিলেন?

—আমি কিছু মনে করে ও নাম রাখিনি কিন্তু—আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না—

—আপনি সত্যি কথা বলছেন?—রাণীসাহেবা হঠাৎ যেন বড় ঋজু হয়ে দাঁড়ালেন।

আমি হঠাৎ এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে কেমন বিমূঢ় হয়ে গেলাম। তাঁর চোখের দিকে তাকালাম। ভয় হলো—ধরা পড়ে গেলাম নাকি! ওকি হাসি নয়, তবে—ভ্রূকুটি!

তারপর আমার দিকে তেমনি ভাবে চেয়েই রাণীসাহেবা বললেন—আমার স্বামীকে আপনি ঘনিষ্ঠভাবেই জানতেন, আমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে কোথাও কোনও ফাঁকি ছিল না—যদি এতদিনের পরিচয়ও সেটা না-বুঝে থাকেন তো......

বলতে বলতে থেমে গেলেন রাণীসাহেবা।

তারপর একসময়ে আশেপাশে চেয়ে নিয়ে বললেন—আজ আমি স্বাধীন উনিও নেই, মিনুও জন্মের মত পর হয়ে গেল—আজ আর বলতে দোষ নেই—কেন আপনি শকুন্তলা নাম রেখেছিলেন তা আর কেউ না বুঝুক—আমি বুঝেছিলাম—

—আমায় ক্ষমা করবেন—আমায় ক্ষমা করবেন আপনি—

—কিন্তু আপনি যে ক্ষমার যোগ্যও নন—শকুন্তলার জন্ম-বৃত্তান্ত আমাদের দেশের একটা সাত বছরের মেয়েও জানে—বলতে বলতে বিদায় সম্ভাষণ না করেই চলে গেলেন দরজার পর্দার আড়ালে। আর আমি খানিকক্ষণ হতবাকের মতন দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে বাইরে চলে এলাম।

ট্রেনে আসতে আসতে ভেবেছি কত কথা। ভেবেছি—অল্প বয়সের ত্রুটির জন্যে যাঁকে সারাটা জীবন প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে—সমস্ত বিলাস-ব্যসন,

শহর, সভ্যতা ছেড়ে যিনি আত্মবিবরে মুখ লুকিয়ে মুহ্যমান মৃতকল্প হয়ে আছেন—আজ রাণীসাহেবার সেই পরিপূর্ণ রূপটাই যেন দেখবার সৌভাগ্য হলো। গোকুল অবশ্য ছিল হতভাগ্য কিন্তু এই রাণীসাহেবাকে দেখলাম আজ তার চেয়ে আরো শতগুণ হতভাগ্য!

মনে মনে সংকল্প করলাম—রাণীসাহেবাকে নিয়ে এখন গল্প লিখবো না। ওই মৃণালিনী যখন শ্বশুরবাড়িতে অত্যাচারে আত্মধিক্কারে উন্মাদ হয়ে আত্মহত্যা করবে—তখনই রাণীসাহেবাকে নিয়ে গল্প লেখার উপযুক্ত সময়।

সেই আমার রাণীসাহেবার সঙ্গে শেষ দেখা। এর পর আর দেখা হয়নি।

শেষ দেখা বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ দেখা নয়। এর পরে যে ছোট ঘটনাটি ঘটলো, সেটি না ঘটলে রাণীসাহেবাকে নিয়ে গল্প লেখবার কোনও সার্থকতাই থাকে না। এতদিনের সমস্ত দেখা একটি মুহূর্তে যেন ভুল-দেখায় পরিণত হলো। সেই ঘটনাটা বলি।

এক সুগার মিলের শেয়ার বিক্রী করতে এক ভদ্রলোক একদিন আমার কাছে এসে হাজির।

সকাল বেলা। লোকটি কিন্তু বড় স্মার্ট!

বললে—শেয়ার আপনাকে আমি এখনি কিনতে বলছি না, কিন্তু আমাদের প্রস্‌পেক্‌টাস্‌খানা একবার পড়তে অনুরোধ করি—ম্যাক্‌সুইনি ব্রাদার্স লিমিটেডের সমস্ত কনসার্ন আমাদের বি. কে. গুপ্ত এন্ড কোং কিনে নিয়েছেন—ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ নতুন হলেও ফার্ম বহুদিনের. প্রেফারেন্‌-শিয়াল্‌ শেয়ারে ডিভিডেন্ড্‌ এইট্‌ পারসেন্ট আর অর্ডিনারী শেয়ার হলো......

উল্টে পাল্টে দেখলাম। 'নরকটিয়াগঞ্জ সুগার ম্যানুফ্যাক্‌চারিং এন্ড ট্রেডিং কনসার্ন—ম্যানেজিং এজেন্টস্‌—বি. কে. গুপ্ত এন্ড কোং—'। সাদা এন্টিক পেপারে রয়্যাল আট পেজি বুকলেট। শেষের পাতায় ব্যালান্স শিট।

ছোকরাটি বললে—আপনি হয়ত ভাববেন নতুন ম্যানেজিং এজেন্টস্‌—কিন্তু বি. কে. গুপ্তকে যারা জানেন তাদের যদি একবার জিজ্ঞেস করে দেখেন......মিস্টার গুপ্ত আমেরিকা আর জাপানে কুড়ি বছর ধরে এই সুগার টেক্‌নোলজি নিয়ে জীবনপাত করেছেন—এতদিন পরে ইন্ডিয়াতে ফিরে এসে আজ ক'বছর হলো এইটে হাতে নিয়েছেন—অদ্ভুত ব্রিলিয়ান্ট কেরিয়ার মশাই—ছোটবেলায় একজন নিজের পয়সা খরচা করে ওঁকে জাপানে পাঠায়—অত্যন্ত গরীবের ছেলে ছিলেন কি না—

খানিক পরে ছোকরাটি বললে—আর একটা ভেতরের কথা তা হলে আপনাকে বলি—বেহারের রাণীসাহেবার নাম শুনেছেন?

চমকে উঠলাম।

--তিনি নিজে এর পেছনে আছেন—তিনি একাই পঞ্চাশ লক্ষ টাকার শেয়ার কিনেছেন এরি মধ্যে, আবার দরকার হলে আরো লক্ষ লক্ষ টাকাব......

বললাম।—রাণীসাহেবা?

আমার চোখে মুখে বোধ হয় বিস্ময় ফুটে উঠেছিল।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, বেহারের রাণীসাহেবা বলতে ওই একজনকেই তো বোঝায়—আপনি চেনেন নাকি—তা সেই রাণীসাহেবাই ওঁকে কুড়ি বছর ধরে আমেরিকায় জাপানে পড়বার খরচ চালিয়ে এসেছেন—ফরেন্ কোন ডিগ্রী আর বাকি নেই। দেশে ফেরবার আর ইচ্ছেই ছিল না, রাণীসাহেবাই ওকে ডেকে এনে ওইতে নামিয়েছেন—আসলে কোম্পানীটা রাণীসাহেবারই বলতে পারেন। অথচ দেখুন মিস্টার গুপ্ত ছোটবেলায় কী গরীবই ছিলেন—জামসেদপুবে পরের বাড়িতে ছেলে পড়িয়ে পর্যন্ত লেখাপড়া চালিয়েছেন—

--কী নাম বললেন? আমি শিরদাঁড়া সোজা করে চেয়ারে উঠে বসলাম।

—আজ্ঞে আমাদেব ম্যানেজিং এজেন্টস্-এর নাম? মিস্টার গুপ্ত—

—পুরো নাম—

—মিস্টাব বি কে গুপ্ত—

—না না—ইনিশিয়াল নয় পুরো নামটা কী—

--বিকাশ গুপ্ত।

ঘরন্তী

এ-গল্পটা হয়ত না লিখতে হলেই আমি খুশী হতাম। কিন্তু লেখক-জীবনের শুরু থেকেই ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধে নিয়ে ভাবা ছেড়ে দিয়েছি। তা ছাড়া নিজের সুখ-অসুখের প্রশ্ন তো এখানে ওঠেই না, কারণ মিসেস চৌধুরীর বিশেষ অনুরোধেই এ-টা লেখা। তবু তিনি গল্পটা আমাকে যে-ভাবে শেষ করতে বলেছিলেন সে-ভাবে শেষ আমি করতে পারবো না বলে দুঃখিত। তিনি যেখানেই থাকুন, এ-গল্প যদি পড়েন, যেন আমায় ক্ষমা করেন।

সেদিনের সেই ঘটনার পর মিসেস চৌধুরী যে কোথায় চলে গেলেন, কেউ জানে না। জানিনা এই বই তাঁর হাতে পড়বে কি না। তবু যদিই তাঁর নজরে পড়ে, তাঁর অবগতির জন্যে জানিয়ে রাখি—লাবণ্য ভাল আছে, লাবণ্যর একটি ছেলে হয়েছে, লাবণ্য ছেলের নাম রেখেছে...

কিন্তু সে-কথা এখন থাক।

মিসেস চৌধুরীর হয়ত মনে নেই সব কথা। কিন্তু আমার আছে।

রাত তখন প্রায় বারোটা। লাবণ্যর বাড়ি থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিতে অনেকক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে শেষে আমার বাড়িতে এসে হাজির হয়েছিলেন। বৃদ্ধা না হোন মিসেস চৌধুরীকে যুবতী বলা চলে না। তবু ঘরে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে উগ্র সেন্টের গন্ধে ঘর ভরে গিয়েছিল। রুজ-মাখা গাল আর লিপস্টিক মাখা ঠোঁটের ওপর যেন কে হঠাৎ কালি লেপে দিয়েছে।

বললেন—একটা ভীষণ বিপদে পড়ে তোমার কাছে এসেছি—তোমাকে একটা গল্প লিখতে হবে বিমল—

বললাম—ব্যাপার কী? কী হলো?

—তুমি কথা দাও লিখবে? তুমি অনেককে নিয়ে লিখেছ, এ-ও তোমারই সাবজেক্ট—

—খুলে বলুন—কী ব্যাপার?

মিসেস চৌধুরী বললেন—লাবণ্যকে নিয়ে তোমায় একটা গল্প লিখতেই হবে—

—লাবণ্য কে?

—বলবো তোমাকে সব, কিন্তু আগে কথা দাও—লিখবে?

অগত্যা কথা দিতেই হলো!

মিসেস চৌধুরী বললেন—যত বদনাম শুধু আমাদেরই বেলায়, কিন্তু তবু তোমাকে বলি, আমাদের আর যা-ই দোষ থাক, আমরা চরিত্রহীন নই। আমার বাড়িতে যারা আসে, আমি যাদের কাছে যাই—তারা কেউ আমাকে সতী সাবিত্রী বলে না জানুক, আমাকে শ্রদ্ধা করে সবাই। অন্তত সমাজকে আমি ঠকিয়েছি এ-কথা কেউ বলবে না। আমার কাছে সরল সোজা কথা। ফেলো কড়ি মাখো তেল। কেউ বলতে পারবে না আমার ঘরে এসে কাউকে পুলিশের হেফাজতে পড়তে হয়েছে। কিন্তু পুলিশ কি কিছু জানে না? জানে বৈ কি! সব জানে। আমার কিসের কারবার, আমার পেট চলে কিসে—সবই জানে। কিন্তু তবু বলে না কেন? তুমি তো দেখেছ আমার বাড়ির পাশেই পুলিশের থানা— তাদের নাকের ওপরেই তো আমার কারবার চলছে—তবু কিছু বলে না কেন?

এ-প্রশ্নের উত্তর মিসেস চৌধুরী অবশ্য আশা করেন না। তাই, আমিও চুপ করে রইলাম।

কথা বলতে বলতে মিসেস চৌধুরীর আধপাকা চুলের খোঁপা খুলে পড়লো। দু'হাতে সেটাকে সামলে নিয়ে আবার বললেন—এই রাত্তির বেলা তোমার ঘরে বসেই বলছি, আমায় কেউ কুলত্যাগিনী বলে জানে, কেউ বা বলে আমার স্বামী আমায় ত্যাগ করেছে—আমি সব জানি সব স্বীকার করি, তোমাদের কাছেও আমি নিজেকে সতী-সাবিত্রী বলে বড়াই করি না, আমি যা আমি তাই-ই। আমার সুটকেস-এর মধ্যে যেদিন মিস্টার চৌধুরী এক প্রেমপত্র আবিষ্কার করলেন—সেদিনও আমি মিথ্যে কথা বলে আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করিনি—তা ছাড়া তোমরা তো জানো, এক গ্লাস বিয়ার খেলে কী-রকম ভুল বকতে শুরু করি,—

কথা বলতে বলতে যেন হাঁফাতে লাগলেন।

বললেন—তুমি হয়ত বিশ্বাস করবে না, বরাবর জানো নিশ্চয়ই সন্ধ্যেবেলা তিন কাপ চা খেয়ে তবে আমার নেশা কাটে, আজ সত্যি বলছি তোমায়, এক-কাপ চা-ও জোটেনি কপালে--

মিসেস চৌধুরীকে যারা জানে তারা বুঝবে এ কী অমানুষিক ঘটনা।

তারপর লজ্জা ত্যাগ করে বললেন—তোমার চাকরকে একবার জাগাও—চা করুক—

সত্যি মনে হলো মিসেস চৌধুরী এক নিদারুণ আঘাত পেয়েছেন যেন। সে-আঘাতে নেশার খোরাক পেতেও ভুলে গেছেন তিনি—এমনি কঠোর তার যন্ত্রণা। নইলে মিসেস চৌধুরীর মত মেয়েমানুষ এই রাত্রে নিজের ব্যবসা ছেড়ে আমার বাড়িতেই বা আসবেন কেন! অথচ সে-আঘাত প্রতিরোধ

করবার ক্ষমতাও যেন তাঁর নেই। দুর্বল অক্ষম আক্রোশে তিনি যেন ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত উপায়ান্তর না দেখে আমার কাছে এসে হাজির হয়েছেন। আমিই বুঝি এখন তাঁর একমাত্র অস্ত্র। গল্প লিখে আমিই একমাত্র তাঁর প্রতিকার করতে পারি যেন।

জিজ্ঞেস করলাম—কিন্তু লাবণ্য কে আপনার?

চায়ের কাপে চুমুক দিতে গিয়ে থেমে গেলেন মিসেস চৌধুরী। বললেন—আমার কেউ না। আসলে আমার নিজের বলতে কে আর আছে বলো! আরো যেমন দশজন ছেলেমেয়ে আসে আমার বাড়িতে—লাবণ্যও তেমনি। এদের সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক! কত মারোয়াড়ী, ভাটিয়া, গুজরাটি, বাঙ্গালী আসে—মেয়ে সঙ্গে করে নিয়ে আসে, কেউ একঘণ্টা, কেউ দু'ঘণ্টা, কেউ তিন ঘণ্টা, কেউ বা সারা রাত ঘর ভাড়া করে—তিনখানা ফারনিশ্ড্ ঘর আমার, ভাড়া নেয়—আবার কাজ ফুরোলে চলে যায়, লাবণ্যও ওদের মত একজন—আমার সঙ্গে ওর সম্পর্ক কিসের?

লাবণ্যর সঙ্গে যদি কোনও সম্পর্কই নেই, তবে তাকে নিয়ে এত মাথাব্যথা, তাকে নিয়ে এই গল্প লেখানোর প্রচেষ্টা কেন, বোঝা গেল না।

মিসেস চৌধুরী বললেন—কিন্তু তা বলে কি তোমরা আমায় অর্থপিশাচ বলবে? এই যে তোমরা আমার ঘরে যাও, নিজের পয়সা খরচ করে খাও-দাও, স্ফূর্তি করো, কখনও ঘর-ভাড়া চেয়েছি? ছোটবেলায় এককালে কবিতা লিখেছি, তাই তোমাদের সঙ্গে মিশি, কিন্তু এ-লাইনে এসে আর ও-সব হলো না,—না হোক, সকলের সব জিনিস হয় না, ওই বাড়িভাড়া থেকে যে ক'টা টাকা আসে, তাইতেই আমাব শেষজীবনটা একরকম করে কাটিয়ে দেব—

মিসেস চৌধুরীকে যারা জানে তারা বুঝতে পারবে এ তাঁর বিনয়ের কথা। যেমন তেমন করে কাটিয়ে দেবার মত জীবন তাঁর নয়। এ ক'বছরে অনেক টাকা তিনি কামিয়েছেন।

একটু থেমে বললেন—ফুলচাঁদকে তুমি দেখেছ?

বললাম—দেখেছি—

—তার মতন অত বড়লোক, যে এককথায় দশহাজাব টাকা বার করে দিতে পারে সে-ও যখন প্রথমে ওই লাবণ্যর জন্যে আটশো টাকা খরচ করবে বলেছিল, আমি রাজী হয়নি—আমি যত বড় ব্যবসাদার মেয়েমানুষই হই না কেন, এককালে তো আমিও ঘরের বউ ছিলাম, রোজ সকালে স্নান করে তুলসীতলায় জল দিয়ে আমিও তো প্রণাম করেছি—আমিও তো ছেলে-মেয়ের মা ছিলাম—আজ না-হয় তোমরা আমায় দেখছ অন্যরকম, এখন পাকা চুলে কলপ মাখি, তোবড়ানো গালে রুজ মাখি—

হঠাৎ মিসেস চৌধুরীর মুখে এ-কথা শুনে কেমন যেন অবাক লাগলো।

বললেন—যাক গে, এ-সব কথা—আমার ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে—তুমি আমার ওখানে চলো—সব গল্পটা তোমায় বলবো—

—এখন? এত রাত্রে?

—তাতে কী হয়েছে?

শেষ পর্যন্ত সে-রাত্রে আমি অবশ্য মিসেস চৌধুরীর বাড়ি যাইনি। অনেক রাত পর্যন্ত মিসেস চৌধুরীই সমস্ত গল্পটা আমায় বলেছিলেন। গল্প যখন শেষ হলো তখন রাত প্রায় তিনটে।

চলে যাবার সময় আমার হাত দুটো ধরে বলেছিলেন—লক্ষ্মীটি, এটা তোমায় লিখতেই হবে—তবে ওই শেষকালটা শুধু বদলে দিও—যেমন ভাবে বললাম ওইভাবে শেষ কোরো—কেমন?

তারপর ট্যাক্সিতে ওঠবার আগে বলেছিলেন—তাহলে কাল বিকেলবেলা আমার ওখানে যাচ্ছো তো?

পরের দিন ঠিক সময়ে গিয়েছিলাম মিসেস চৌধুরীর বাড়ি। কিন্তু দেখা তাঁর পাইনি। দরজায় তালা দেওয়া। শুনেছিলাম—মিসেস চৌধুরী বাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন কোথায় কেউ জানে না।

তাঁর সঙ্গে সে-ই আমার শেষ দেখা।

শেষ দেখা বটে, কিন্তু সম্পর্ক সেখানেই শেষ হয়নি। অনেক গল্পের সূচনায়—যখন কী নিয়ে লিখবো ভেবেছি—তখন মিসেস চৌধুরীর গল্পটার কথাও মনে হয়েছে বার বার। মনে হয়েছে—নিরঞ্জন আর লাবণ্যর গল্পটা লিখেই ফেলি। যেমনভাবে শেষ করতে বলেছিলেন তেমনি করেই না হয় শেষ করি। মিসেস চৌধুরী যেখানেই থাকুন এ-গল্প তাঁর হাতে পড়তেও পারে। একদিন আমাকে স্নেহ করতেন, ভালবাসতেন—সে-স্নেহ সে-ভালবাসার কিছুটা অন্তত তা হলে পরিশোধ হয়।

কিন্তু মন সায় দেয়নি।

ট্রামে বাসে সিনেমায় সংসারে সর্বত্র লাবণ্যকে খুঁজে ফিরেছে আমার মন। সন্ধ্যেবেলা চৌরঙ্গীর ধারে গালে সস্তা পাউডার আর আলতা মাখা ঠোঁট দেখে অনেকবার চমকে উঠেছি। ভেবেছি—এই-ই বোধ হয় মিসেস চৌধুরীর লাবণ্য! লাবণ্যর জীবন হয়ত এইখানে এসেই থেমেছে। আবার কখনও কোনও নতুন পরিচিত পরিবারের শান্ত সান্ধ্য পরিবেষ্টনীতে—পুত্র-কন্যার আনন্দ পরিবেশে—গৃহিণীর দিকে চেয়ে চোখ আমার অপলক হয়ে গেছে—এই-ই কি লাবণ্য? হয়ত নিরঞ্জনের উদার প্রেমের প্রাচুর্যে সে-লাবণ্য এখন মহীয়সী হয়ে উঠেছে! কিন্তু তবু আমার অনুসন্ধিৎসু মনের ক্ষুধা মেটেনি কোথাও। মিসেস চৌধুরীর কল্পিত পরিণতির সঙ্গে,

লাবণ্যর বাস্তব জীবনের পরিণতির যেন কোথাও অসংগতি ছিল। আমার উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে কোনদিন তার কোনও সমাধান খুঁজে পাইনি!

তা নিরঞ্জনের মত পুরুষকে তো আজো দেখি সকালবেলা বাসে চড়ে অফিসে যেতে। টেনে বুনে একশো টাকাই না হয় মাইনে পাক! টুইলের শার্ট—আর মিলের কাপড়! এক কথায় মোটা ভাত আর মোটা কাপড়। একটা পেট—একশো টাকায় একরকম করে চলে যায় বৈকি! আর লাবণ্য?

মিসেস চৌধুরী বলেছিলেন—লাবণ্যও ছিল ওই নিরঞ্জনের মত সাদাসিধে—পঞ্চান্ন টাকা মাইনে আর পঞ্চাশ টাকা ডিয়ারনেস্—

তা সত্যি! আমিও ভাবি, ও-মাইনেতে ওর চেয়ে বিলাসিতা কী করে করা যায়। বিশেষ করে মেসের খরচ, বাসভাড়া, টিফিন। তারপর দু একদিন কি সিনেমাতেও যেত না?

কেমন করে ওদের আলাপ হলো কে জানে। গ্রহচক্রের কোন্ ষড়যন্ত্রের ফলে কক্ষভ্রষ্ট হয়ে দু'জনে দু'জনের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল একদিন—; তারপর ওদের আর ছাড়াছাড়ি হলো না কেন, তাই বা কে জানে! ওদের নিয়ে একদিন গল্প লেখাতে হবে এ-ধারণা থাকলে মিসেস চৌধুরীই সে কথা নিশ্চয়ই জেনে রাখতেন। কিন্তু আর যা-ই হোক, পছন্দের বাহবা দিতে হবে বটে নিরঞ্জনের।

মিসেস চৌধুরী বলেন—লাবণ্য রোগা হলে কী হবে—ওর গালের তিলটার জন্যে সকলের ওকেই খুব পছন্দ হতো—

তা লাবণ্যকে আমিও কল্পনা করে নিতে পারি বৈ কি! মিসেস চৌধুরীর বর্ণনার সঙ্গে অনেক সময় বাসের ট্রামের মেয়েদের মিলিয়েও নিই। যেন মনে হয়—এক লাবণ্য আজ এক'শ লাবণ্য হয়ে সারা কলকাতায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর লিন্ডসে স্ট্রীটের মোড়ের ওপর একটি ছেলে আর একটি মেয়েকে একসঙ্গে যেতে দেখলে—কেমন যেন মনে হয় ওরা সেই নিরঞ্জন আর লাবণ্য। অফিসের ছুটির পর ওরা আজ চলেছে মিসেস চৌধুরীর ফ্রি-স্কুল স্ট্রীটের বাড়িটার দিকে! মাসের প্রথম দিক। পাঁচ টাকা দিয়ে এক ঘণ্টার জন্যে একটা ঘর ভাড়া করে ওরা পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে বসবে—ঘনিষ্ঠ হবে— একাত্ম হবে—!

এক একদিন পেছন পেছন অনুসরণও করেছি ওদের। তবে কি মিসেস চৌধুরী আবার ব্যবসা শুরু করেছেন। সেই আগেকার মতন! সাহেব,

মেম, মোটর, দোকান-পত্তর পেরিয়ে সামনের নিরঞ্জন আর লাবণ্য পাশাপাশি চলেছে। গায়ে টুইলের শার্ট। পায়ে মোটা কাবলি জুতো। পাশে গিয়ে দেখা যায়—নিখুঁত করে দাড়ি কামিয়েছে আজ। আর তারই পাশে লাবণ্য। নতুন কেনা স্কার্ট শাড়িটা পরেছে আজ। কানের একটা দুল কেনবার পয়সাও নেই ওর। গলায় পরেছে ঝুটো মুক্তোর নেকলেস। একটু তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে পাশ থেকে ভালো করে দেখতে লাগলাম। রাস্তার জনস্রোতের মধ্যে আমাকে দেখতে পাবে না ওরা। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম। ওদের নিয়ে গল্প লিখতে হবে—ভালো করে দেখা চাই। মিসেস চৌধুরীর বর্ণনার সঙ্গে আজো এদের কোনও অমিল নেই যেন। লাবণ্যর পায়ের চটিটার পর্যন্ত যেন কোনও পরিবর্তন হয়নি। এত বছর পরেও কি সেই চটিটাই পরছে! নিরঞ্জনও কি দশ বছর আগের সেই টুইলের শার্ট-টাও বদলায়নি আজ পর্যন্ত।

সেই বিকেলের আলো-ছায়ার মধ্যে জনবহুল রাস্তার স্রোতে মিসেস চৌধুরীর কাছে শোনা নিরঞ্জন আর লাবণ্য যেন আবার রক্ত-মাংসের শরীর নিয়ে হাজির হলো আমার সামনে।

নিরঞ্জন বলছে—এ শাড়িটা পরে তোমায় খুব ভালো দেখাচ্ছে কিন্তু -

--কত দাম নিলে এর?

আরো পাশে গিয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে শুনতে লাগলাম ওদের কথা।

নিরঞ্জন বলছে—দাম এখনও দিইনি, চেনা-শোনা দোকান—মাসে মাসে দু'টাকা করে দিলেই চলবে।

লাবণ্য বললে—কিন্তু কেন কিনতে গেলে শাড়িটা, তোমার জুতোটা তো বহুদিন ধরে ছিঁড়ে গেছে—জুতো একজোড়া কিনলে হত তোমার—

নিরঞ্জন বলে—আসছে মাসে চাকরিটা পাকা হলে কিনবো—তার আগে নয়—

লাবণ্য বলে—কিন্তু এখন থেকে কিছু টাকা তো জমানোও আমাদের দরকার—তা' না হলে আর কতদিন মিসেস চৌধুরীর ঘর ভাড়া নিয়ে চলবে—গত মাসে দু'দিনের ভাড়া এখনও বাকি আছে যে।

নিরঞ্জনের মুখটা দেখতে পাই এবার ভালো করে। নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবনের ভবিষ্যৎ-হীন দিন-যাপনের ক্লান্তির ফাঁকে ফাঁকে যেন কোথাও এক টুকরো আশা উঁকি মারে। লাবণ্য আর সে বাড়ি ভাড়া করবে একটা। একটা স্বাধীন দু'ঘর-ওয়ালা ফ্ল্যাট। তিরিশ কিম্বা চল্লিশ এমন কি পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত ভাড়া দেবে। তারপর যদি ভবিষ্যতে কোনওদিন সুদিন আসে, সেদিন...

নিরঞ্জন চলতে চলতে হঠাৎ বললে—একটা ভালো বাড়ির সন্ধান পেয়েছি—জানো—

লাবণ্য চমকে ওঠে—কত ভাড়া?

—ভাড়া বেশি নয়, পঞ্চাশ—কিন্তু—

—সেলামী চায় বুঝি?

সেলামী ছাড়া বাড়ি পাওয়া কি সম্ভব নয়? চেষ্টা করলে কী না পাওয়া যায়! চেষ্টা কি আর নিরঞ্জন কম করেছে? আজ দু'বছর ধরে পরিচয় হয়েছে।

অনেকদিন থেকেই চেষ্টা চলেছে। একটা বাড়ি পেলেই তো সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। তাহলে এমন করে আর মিসেস চৌধুরীর ঘর ভাড়ার জন্যে টাকা নষ্ট করতে হয় না। মাসে এখানে চার দিন এলেই তো চার-পাঁচে কুড়ি টাকা চলে গেল। এক-এক মাসে পাঁচদিন ছ'দিনও এসেছে! তবে মিসেস চৌধুরী লোক ভালো। ব্যবহার ভালো তাঁর। হাতে নগদ টাকা না থাকলে বাকিতেও চলে। তা'ছাড়া ক'ঘণ্টাই বা থাকে তারা। বাস-ট্রাম বন্ধ হবার আগেই বেরিয়ে আসতে হয়। তারপর আবার কতদিন পরে দেখা হবে! চলতে চলতে লাবণ্যর হাতটা ধরে নিরঞ্জন।

ওদের কথা শুনতে শুনতে আমিও যেন এগিয়ে চলি। হঠাৎ মানুষের ভিড় আর দোকানপত্রের সার পেরিয়ে কখন নিরঞ্জন আর লাবণ্য কোথায় হারিয়ে যায়। একলা একলা মিসেস চৌধুরীর ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াই। হঠাৎ যেন স্বপ্নও ভেঙে যায়! সেই পরিচিত বাড়িটার সামনের ঘরে একদল সাহেব মেম সেজেগুজে বসে আছে, ভেতর থেকে পিয়ানোর শব্দ আসছে। মিসেস চৌধুরীর বাড়ির সেই নেপালী দারোয়ানটা আর সেলাম করলে না আগেকার মত!

মিসেস চৌধুরী বলতেন—টালীগঞ্জ থেকে বাসন্তী আসতো, চেতলা থেকে আসতো কল্যাণী, বেহালা থেকে আসতো টগর—কিন্তু এক-একদিন এক-একজনের সঙ্গে—চৌরঙ্গীর রাস্তা থেকে যাকে পেত ধরে আনতো—কিন্তু লাবণ্য? বরাবর নিরঞ্জনকে দেখেছি সঙ্গে—নিরঞ্জনের যখন চাকরি ছিল না, ও-ই লাবণ্যই তিন মাস মেসের খরচ জুগিয়েছে ওর।

ঘর-ভাড়া হয়ত শহরে আরো অনেক জায়গায় পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে এমন রুচি আর শালীনতা পাবে না। বাইরে থেকে বোঝবার কিছু উপায় নেই। সামনে অর্কিড আর মর্নিং গ্লোরি দিয়ে ঘেরা। পেছনের দরজা দিয়ে সোজা চলে যাও ভেতরে। কোণাকোণি তিনটে ঘর। পর্দা ঠেলে ঘরের ভেতর যেতে হবে। একটা ঘরে ইংলিশ খাট, একটা ড্রেসিং আয়না আর দুটো চেয়ার—আসবাব বলতে এই। ঘরের সঙ্গে লাগোয়া

বাথরুম। ব্যবস্থা পুরোদস্তুর বিলিতি। এখানে টাকা খরচ করেও তো আরাম।

মনে আছে হঠাৎ মিসেস চৌধুরী তাস খেলতে খেলতে উঠে পড়লেন একদিন।

জর্জেটটা সামলে নিয়ে বললেন—দেখি, ওদিকে গোলমাল কিসের—আমায় তাস দিয়ো না ভাই—

বাইরে থেকে যেন খানিকটা বচসার শব্দ কানে এল।

তারপর প্রচণ্ড শব্দ করে ডেকে উঠল মিসেস চৌধুরীর অ্যাল-সেসিয়ানটা।

খানিক পরে মিসেস চৌধুরী ঘরে ঢুকে পাখার রেগুলেটারটা বাড়িয়ে দিলেন।

বললাম—ব্যাপার কী?

—আর বলো কেন, শেঠজি এসেছিল। ফুলচাঁদ শেঠ। মদে চুর একেবারে—একদিন বারণ করে দিয়েছি—তবু—

নির্বিকারভাবে আবার তাস খেলতে লাগলেন—নো বিড্—থ্রি ডায়মণ্ডস্—

সেদিন অনেকদিন পরে সেই ফুলচাঁদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, লম্বাচওড়া একটা মোটর হঠাৎ সামনে এসে ব্রেক কষে দাঁড়াল। দেখি ফুলচাঁদ। কে বলবে চল্লিশ বছর বয়েস। নিজেই ড্রাইভ করছে।

মুখ বাড়িয়ে হেসে বললেন—কী খবর স্যার?

আমিও আশা করছিলাম কিছু খবর পাবো। কিন্তু ফুলচাঁদই প্রশ্ন করলে—মিসেস চৌধুরীর খবর কিছু জানেন স্যার?

ফুলচাঁদ শেঠের ভাবনা নেই। হয় এ-পাড়ায় নয় ও-পাড়ায়—যেখানে হোক আড্ডা ও খুঁজে নেবেই। মিসেস চৌধুরী না থাক—মিসেস সরকার আছে। নার্সিং হোম আছে। কত কী আছে কলকাতা শহরে। ছোকরা বয়েস। দিন-দিন যেন বয়েস কমছে ফুলচাঁদের। তিনটে আসল আর দুটো ভেজাল ভেজিটেবল্ ঘি-এর কারবার। গাড়িটা চলে যাবার অনেকক্ষণ পর পর্যন্ত সেদিকে চেয়ে রইলাম।

কিন্তু সেদিনই সত্যি সত্যি বসলাম কলমটা নিয়ে। এবার লিখতেই হবে। মিসেস চৌধুরী যেমনভাবে শেষ করতে বলেছিলেন—সেইভাবেই শেষ করব না-হয়।

প্রথমেই লিখলাম—নিরঞ্জন দাঁড়িয়ে আছে সাপ্লাই অফিসের একতলার সিঁড়ির সামনে। লাবণ্যর অফিসের ছুটি হয়ে গেছে। একে একে নামতে শুরু করেছে সবাই।

লাবণ্যও চমকে উঠেছে কম না। বললে—একি, তুমি?

নিরঞ্জন বললে—তোমার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি।

—আজ তো কথা ছিল না তোমার আসবার—

—তা হোক, তবু এলাম—মিসেস চৌধুরীর বাড়ি যাবো—আজ বড় যেতে ইচ্ছে করছে—

—কিন্তু টাকা? টাকা এনেছ? আমার তো হাত খালি, শুধু বাস-ভাড়াটা—

—সে এক-রকম বলে কয়ে ব্যবস্থা করা যাবে, আজ যেতেই হবে তোমায়—জানো লাবণ্য আমার চাকরিটা চলে গেছে—

—সে কী?

মিসেস চৌধুরী শুনেছেন সে-সব কথা। তিনি জানতেন লাবণ্যর সে কৃচ্ছ্রসাধনের ইতিহাস। ধোপার বাড়ি কাপড় দেওয়া বন্ধ হলো লাবণ্যর সেই দিন থেকে। শুরু হলো সেকেন্ড ক্লাশ ট্রামে চড়া। টিফিন বন্ধ। এক-একদিন নিজের জলখাবারটা রুমালে করে বেঁধে নিয়ে ভাগ করে খেয়েছে মিসেস চৌধুরীর ঘরে দরজা বন্ধ করে। চুলে তেল পড়তে লাগল এক-দিন-অন্তর। স্নো ফুরিয়ে গেলে আর কেনা হলো না।

মিসেস চৌধুরী বলেছিলেন—ওদের জন্যে দিলাম কনসেসন করে--আমার ঘরের ভাড়ার রেট পাঁচ টাকা বরাবর—ওদের জন্যে ঠিক হলো তিন টাকা—তা-ও সব সময় নগদ দিতে পারত না—বাকি পড়ত—

কিন্তু ওদিকে টালিগঞ্জের বাসন্তীর তখন গায়ে ঢাকাই শাড়ি উঠেছে। চেতলার কল্যাণী নতুন এক ছড়া হার গড়ালো। বেহালার টগরও ব্রঞ্জের চুড়ি ভেঙে গিনি সোনার কঙ্কন গড়িয়েছে। বাজার গরম বেশ।

সে-বাজারে মিসেস্ চৌধুরীই বা ছাড়বেন কেন? ঘর-ভাড়া পাঁচ টাকা থেকে বেড়ে দশ টাকা হলো। তাতেও খালি পড়ে থাকে না। খদ্দের এসে ফিরে যায় বাইরে থেকে। মিসেস্ চৌধুরীর টেলিফোন সারা দিন রাত এনগেজড্ থাকে!

মনে আছে একদিন খুব ভয় পেয়েছিলাম আমি।

দুপুরবেলা। খাওয়া-দাওয়া করে মিসেস্ চৌধুরীর সঙ্গে আড্ডা দেবার উদ্দেশ্যে গিয়েছিলাম। ইচ্ছে—নতুন বইটা ওকে এক কপি উপহার দেবো। তারপর ওঁরই বিছানায় শুয়ে শুয়ে পড়ে শোনাবো জায়গায় জায়গায়। মিসেস্ চৌধুরী সাহিত্যিক না হোন, সাহিত্য-রসিক। ওঁকে বই দিয়ে আমরা নিজেদের কৃতার্থ বোধ করতাম। কিন্তু দূর থেকে দেখি, বাড়ির সামনে ভীষণ ভিড়। অনেকখানি জায়গা জুড়ে গোল হয়ে ফুটপাথের ওপর লোক জমা হয়েছে। কয়েকটা পুলিশও সেখানে

দাঁড়িয়ে। মনে হলো—নিশ্চয়ই কোনও গোলমাল, কোনও কেলেঙ্কারী বেধেছে। এবারে মিসেস্ চৌধুরীর আর নিস্তার নেই। আমাদের আড্ডা ভাঙলো বুঝি।

যাবো কি যাবো না ভাবছি। শেষকালে আমরাও কি জড়িয়ে পড়বো। কথাটা ভাবতেই কেমন লজ্জা হেলা। ছি-ছি। আমরা কি বিপদের দিনে ও'কে এমনি করেই ফেলে পালাবো! সেই দিন সত্যি প্রথম উপলব্ধি হলো—মিসেস্ চৌধুরী কতখানি একলা। পৃথিবীতে মেয়েমানুষ হয়ে জন্মাবার পর সারা জীবন একজন অভিভাবকের প্রয়োজন কেন এত অপরিহার্য।

মিসেস্ চৌধুরী, আপনি যেখানেই থাকুন, আজ অকপটে স্বীকার করছি—সেদিন আপনার জন্যে আমার মায়া হয়েছিল সত্যি!

যাক্ সে কথা! আপনার বাড়িতে গিয়েই আমি বলেছিলাম—আজ বড় ভয় পেয়েছিলাম—

আপনি তখন সালোয়ার পায়জামা পরে কৌচে ঠেস দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। জিজ্ঞেস করেছিলেন—কেন?

কিন্তু উদ্বেগের লেশমাত্র ছায়াও আপনার মুখে ছিল না।

আমি বললাম—বাড়ির সামনে ভিড় দেখে ভাবলাম বুঝি পুলিশের হ্যাঙ্গাম, কিন্তু—

পুলিশের নাম শুনে আপনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আবার কৌচে হেলান দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—কিন্তু কী?

—কিন্তু দেখলাম ফুটপাথের ওপর বাঁদর নাচ হচ্ছে—

আপনি হেসে বলেছিলেন—না, সে সব ভয় নেই, পুলিশ আমার কিছু করবে না—তবে ভয় ফুলচাঁদকে নিয়ে—

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম—কেন, ফুলচাঁদ আপনার কী করতে পারে?

আপনি বলেছিলেন—না, আমার আর সে কী করবে? ফুলচাঁদ আমার চেয়ে বড়লোক হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে তার টিকি বাঁধা—কিন্তু ভয় অন্য ব্যাপারে—

—অন্য কী ব্যাপার?

—ভয় লাবণ্যর জন্যে—বলে আপনি গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন।

তখন আমি জিজ্ঞেস করিনি—কে লাবণ্য! কী তার পরিচয়!

আপনার হয়ত মনে নেই আপনি নিজের মনেই যেন বলেছিলেন—লাবণ্যকে ফুলচাঁদ বহুদিন থেকে চাইছে—দু'শো পর্যন্ত খরচ করতে রাজী—আমিই রাজী হইনি—শেষে কোন্ দিন না—

মনে আছে এবারে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম—লাবণ্য কে ?

আপনি সে-প্রশ্নের জবাব দেননি। আপনি তেমনি কোঁচে হেলান দিয়েই বলেছিলেন—ফুলচাঁদ যদি বাসন্তীকে চাইতো আপত্তি করতাম না—কল্যাণীকে চাইলেও চলতো—টগরের বেলাতেও কিছু বলবার ছিল না—আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে টেলিফোনে আনিয়ে নিতাম—কিন্তু তা বলে লাবণ্য ? ছি-ছি—

লাবণ্যকে আপনি কেন অতখানি সম্মান করতেন তা সেদিন কিছুটা যেন বুঝেছিলাম, আর কিছুটা যেন বুঝতে চেষ্টাই করিনি। সেদিন মিসেস চৌধুরীই কি জানতেন, তাঁর সেই লাবণ্যকে নিয়ে গল্প লেখানোর জন্যে একদিন রাত বারোটার সময় আমার বাড়িতেই আসতে হবে!

হয়ত মিসেস্ চৌধুরী নিজের জীবনে যা হারিয়েছিলেন, তা ফিরে পেয়েছিলেন লাবণ্যর মধ্যে। হয়ত সেই জন্যেই ফুলচাঁদের হাতে লাবণ্যকে তুলে দিয়ে নিজেকেই অপমান করতে চাননি! কে জানে!

তাই ফুলচাঁদের প্রস্তাবের উত্তরে মিসেস্ চৌধুরী বলেছিলেন—দু'শো কেন—পাঁচ শো টাকা দিলেও লাবণ্যকে পাবে না—ওর দিকে তুমি নজর দিও না ফুলচাঁদ—

কিন্তু ফুলচাঁদকে আপনি চিনতে পারেন নি। ফুলচাঁদ শেঠ জাত ব্যবসাদার। সাত পুরুষের ব্যবসাদার। কখন কিনতে হবে, কখন বেচতে হবে—তা সে জানে। সেও তাই ধাপে ধাপে উঠেছে। পাঁচ শো'তে রাজি না হয় সাতশো। সাতশো'তে রাজি না হয় আটশো—আটশো'তে রাজি না হয়—

আজো যেন চেষ্টা করলে দেখতে পারি—

দেখতে পারি—তেতলার থেকে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসছে নিরঞ্জন! পাশে লাবণ্য!

লাবণ্য যেন খুশীতে উচ্ছল—। বললে—দেখেছ, একটু মাটি নেই কোথাও বাড়িটাতে—

নিরঞ্জন বুঝতে পারলে না। বললে—কেন, মাটি দিয়ে কী হবে ?

—একটা তুলসী গাছ পুঁততাম—হিন্দু গেরস্থের বাড়িতে তুলসী গাছ রাখতে হয় যে—

নিরঞ্জন বললে—তা সে একটা টবে পুঁতলেই চলবে—এই রান্নাঘরের পাশে—

—কিন্তু শোবার-ঘর কোন্‌টা করবে ?

—দক্ষিণের ঘরটাই তো ভালো সবচেয়ে, জানলা খুললে আকাশ দেখা যায়—

—একটা খাট কিন্তু কিনতে হবে আমাদের—

নিরঞ্জন হেসে উঠলো—সবুর করো, সবে তো চাকরি হলো—আস্তে আস্তে হবে সব—আগে বাড়িটাই হোক—

বাড়ির মালিক বললেন—আমার এক কথা—ভাড়া চল্লিশ টাকা—যা সবাই দিচ্ছে আপনারাও তাই দেবেন—কিন্তু--

কিন্তু কী ?

মালিক এবার আসল কথাটা পাড়লেন। বললেন—ব্যবসায় আমার অনেক লোকসান গেছে এদানি—এখন ওই বাড়ি ভাড়াতেই সংসার চলছে একরকম, তা সেলামী কিছু দিতে হবে আপনাদের—

নিরঞ্জন দমে গেল। লাবণ্যও ফিরে আসছিল। এমন ঘটনা প্রথম নয়। আগে জানতে পারলে—

তবু নিরঞ্জন জিজ্ঞেস করলে—কত ?

যেন কম-সম হলে দিতে তৈরি সে।

মালিক বললেন—বেশি না, আর সব টেনেন্ট যা দিয়েছেন, তা-ই দেবেন—তার এক পয়সা বেশি নেব না—আমার কাছে সবাই সমান—

সাম্যবাদীর মতন পরম নিস্পৃহ ভঙ্গী করলেন তিনি।

—তবু কত ?

—পুরোপুরিই দেবেন—ভাঙা-ভাঙতি ভালোবাসিনা আমি—

তবু দুর্বোধ্য হচ্ছেন দেখে দয়া করে খুলে বললেন—হাজারের কম আমি নিইনে—

ফুলচাঁদও সেদিন সেই কথাই বললে—আটশো'তে রাজি না হয় হাজার—

সংখ্যাটা পুরোপুরি হলে যেন অন্য রকম শোনায়। কিন্তু নিজের কানকে আপনি বোধ হয় বিশ্বাস করতে পেরেছিলেন মিসেস চৌধুরী। তাই হয়ত দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করেন নি। তবু কিন্তু আপনাকে ব্যস্ত হতে দেখা গেল না। আপনি তেমনি নির্বিকারভাবে টফি চুষতে লাগলেন।

কিন্তু ঘটনাচক্রে ঠিক তখনই কি লাবণ্য আর নিরঞ্জনকে সামনে দিয়ে যেতে হয়! রাত তখন সাড়ে ন'টা। চটি ফটাস্‌-ফটাস্‌ করতে করতে চলেছে লাবণ্য। সারা দিন অফিসের খাটনির পর বাড়ি ফিরতে পারলে সে বাঁচে। আপনার মনে হলো—ও তো লাবণ্য নয়। আপনার ভাষাতেই বলি—আপনার মনে হলো—ও তো লাবণ্য নয়, ও যেন আপনার বিগত-জীবন, আপনার পরিশুদ্ধ আত্মা আপনাকে ব্যঙ্গ করে আপনার দিকেই পেছন ফিরে যেন চলে যাচ্ছে। আর ফিরে আসবে না কোনওদিন।

আপনি সেখানে বসেই নেপালী দারোয়ানকে ডাকলেন—জঙ্গী।

জঙ্গী তিন লাফে এসে য়্যাটেনশনের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে স্যালিউট্ করার পর আপনি বললেন—লাবণ্যকে ডেকে দে তো—

লাবণ্য এল।

আপনি আপনার আত্মার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালেন। এবং সেই বোধ হয় প্রথম আর শেষবার।

তারপর তাকে আড়ালে নিয়ে এসে ফুলচাঁদের প্রস্তাবটা জানালেন। আপনার মনে হলো পৃথিবীর প্রচ্ছদপটে আজ পর্যন্ত যত মানুষের পদছায়া পড়েছে, সেই কোটি কোটি সংখ্যাহীন জনসমুদ্রের তরঙ্গ যদি আবার উদ্বেলিত হয় তো হোক। নক্ষত্র-নীল আকাশের সমস্ত জ্যোতিষ্ক আবার কক্ষচ্যুত কেন্দ্রচ্যুত হয়ে যদি দিকভ্রান্ত হয় তো হোক। তবু আপনার আত্মা অচল অটল থাকবে! লাবণ্য কিন্তু সমস্ত শুনে মাথা নিচু করে রইল খানিকক্ষণ।

তারপর যেন দাঁতে দাঁত চেপে বললে—ওকে একবার জিজ্ঞেস করি মাসিমা—

মর্নিং গ্লোরির আড়ালে অন্ধকারে একলা অপেক্ষা করছিল নিরঞ্জন। লাবণ্য সেখানে গেল। তারপর অনেকক্ষণ ধরে কী যেন পরামর্শ হলো দুজনে। দূর থেকে কিছু শোনা গেল না। তবু আভাসে বোঝা গেল—একজন বুঝি বোঝাতে চাইছে আর একজন যেন কিছুতেই বুঝতে চাইছে না।

এক সময়ে লাবণ্য এল। আপনার সামনে এসে মাথা নিচু করে বললে—আমি রাজী—

কথাটা বোধ হয় লাবণ্য একটু আস্তেই বলেছিল, কিন্তু আপনি দেখতে পেলেন—ঘরের ভেতর ফুলচাঁদ সে কথা শুনে নতুন ধরানো সিগ্রেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সোফা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে। আর—আপনি যে আপনি—আপনারও মনে হলো বারান্দায় চেইনে-বাঁধা অ্যালসেসিয়ানটা যেন বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলো।

বললাম—তারপর?

মিসেস চৌধুরীর পাকা চুলের খোঁপাটা আবার একবার খুলে গেল। এবার সেটাকে আর সামলাবার চেষ্টা করলেন না। বললেন—তারপর?

সেই প্রথম, সেই শেষ। আর আসেনি তারা আমার বাড়িতে—ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের লোকেরা আর কোনওদিন সে রাস্তায় হাঁটতে দেখেনি নিরঞ্জন আর লাবণ্যকে। জিজ্ঞেস করলাম—তবে কোথায় গেল তারা—

মিসেস চৌধুরী বললেন—আমিও তাই ভাবতুম—কোথায় গেল তারা। মনে হতো—সেও বোধহয় অন্য মেয়েদের পর্যায়ে নেমে এসেছে—টালিগঞ্জের বাসন্তীকে জিজ্ঞেস করেছি, চেতলার কল্যাণীকে জিজ্ঞেস করেছি—বেহালার টগরকে জিজ্ঞেস করেছি—তারা এখনও আসে কিন্তু বলতে পারে না কোথায় গেছে তারা—এমন কি ফুলচাঁদও না—

আবার জিজ্ঞেস করলাম—তবে হয়ত ওই ঘটনার পর নিরঞ্জন ত্যাগ করেছে তাকে—

—তাও ভেবেছি অনেকবার। হয়ত অবিশ্বাসে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে নিরঞ্জন—আর ওদিকে আত্মধিক্কারে হয়ত আত্মহত্যা করেছে লাবণ্য। নিজের আত্মাকে আমি নিজের হাতে টুঁটি টিপে মেরে ফেলতে পেরেছি জেনে মনে মনে খুব খুশীই হয়েছিলাম—সত্যি বলছি—খুবই খুশী হয়েছিলাম। মিস্টার চৌধুরী যেদিন বিয়ের পর আমার সুট-কেসের মধ্যে একটা প্রেম-পত্র আবিষ্কার করে আমায় ত্যাগ করেছিলেন, তারপর জীবনে এই প্রথম এমন খুশী হতে পারা—সে যে কী আনন্দ। সে আনন্দে সেদিন বিকেলবেলা ঘুম থেকে উঠে তিন কাপের বদলে তিন-ত্রিক্‌কে-ন' কাপ চা-ই খেয়ে ফেললাম—

মিসেস চৌধুরীর মুখের দিকে চেয়ে দেখি তিনি কথা বলছেন আর চোখ বেয়ে জল পড়ে তাঁর গালের রুজ ঠোঁটের লিপস্টিক চোখের সুর্মা সব ধুয়ে মুছে একাকার হয়ে যাচ্ছে। এমন অবস্থা তাঁর আগে কখনও দেখিনি। কী যে করবো বুঝতে পারলাম না।

তারপর মিসেস চৌধুরী হঠাৎ সপ্রতিভ হয়ে ব্যাগ খুলে একটা চিঠি বার করলেন।

আমার দিকে সেখানা এগিয়ে দিয়ে বললেন—তারপর এতদিন পরে আজ সকাল বেলা এই চিঠি—চিঠি পড়ে আমি তো অবাক—

দেখলাম নিরঞ্জন আর লাবণ্যর বিয়ের নিমন্ত্রণের চিঠি। পনেরোর সি কালী সরকার রোড, তেরো নম্বর সুাট। আজকের তারিখ।

আমি মিসেস চৌধুরীর দিকে নির্বাক দৃষ্টি দিয়ে চাইতেই তিনি বললেন—এখন সেখান থেকেই আসছি—

বললাম—কী দেখলেন?

—দেখলাম বিয়েতে যেমন হয় তেমনিই, লাবণ্য সিঁথিতে সিঁদুর পরেছে, পরেছে চন্দনের ফোঁটা। নিরঞ্জনের গায়েও গরদের পাঞ্জাবী, মাথায় টোপর।

হঠাৎ কোথা থেকে সব আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব এসে পড়েছে, এতদিন কোথায় ছিল তারা সব কে জানে! আজ হঠাৎ ওদের শুভাকাঙ্ক্ষীর আর আশীর্বাদকের অভাব নেই। বাড়িটাও ভালো, রান্নাঘরের পাশে একটা টবে তুলসীগাছ প্রতিষ্ঠা করেছে, শোবার ঘরে একটা খাট, দক্ষিণ দিকের জানালা খুললে আকাশ দেখা যায়—আয়োজনও করেছে প্রচুর—কিন্তু ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলাম—ফুলচাঁদের স্পর্শের কলঙ্ক কোথাও নেই এতটুকু—চন্দনের ফোঁটায় সব ঢেকে গেছে—কিন্তু আমার যেন কিছু ভালো লাগলো না—আমি জলস্পর্শ না করে সোজা চলে এলাম বাইরে, তারপর একটা ট্যাক্সি ডেকে সমস্ত কলকাতাটা টো টো ক'রে ঘুরে এখন এই রাত বারোটার সময় তোমার এখানে—

গল্প বলতে বলতে মিসেস চৌধুরী কেমন যেন স্তিমিত হয়ে এলেন। মনে হলো এখনি যেন তিনি নিবে যাবেন—

বললাম—তা হোক, তবু নিরঞ্জনের উদারতা আছে বলতে হবে—

মিসেস চৌধুরী দপ্ করে উঠলেন—তা থাকগে উদারতা, কিন্তু গল্পে তুমি ওদের বিয়ে দিতে পারবে না—শেষটুকু তোমায় বদলাতেই হবে—

কেন?

মিসেস চৌধুরী দম নিয়ে বলতে লাগলেন—হ্যা, আগাগোড়া সব ঠিক রেখে শেষকালটাতে বদলে দেবে—বিয়ে ওদের কিছুতেই দিতে পারবে না তোমার গল্পে—ওর আত্মায় ঘুণ ধরেছে যে—আমি মিসেস চৌধুরী তার সাক্ষী—

বললাম—কিন্তু আত্মা তো মরে না—

—নিশ্চয় মরে, আলবৎ মরে, আমার আত্মা মরেছে—লাবণ্যর মরেছে - বাসন্তী, কল্যাণী, টগর সকলের মরেছে—আর তা ছাড়া যদি বিয়ে দিতেই হয় তো দু'দিন বাদেই ওদের বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিও—তারপর ধাপে ধাপে লাবণ্যকে কল্যাণী, বাসন্তী আর টগরের পর্যায়ে নামিয়ে আনবে, আর তারপর একদিন জীবনের শেষ অঙ্কে দেখাবে—লাবণ্য বাড়ি ভাড়া নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছে আমার মতন ..পারবে না করতে? লক্ষ্মীটি, শেষটুকু ট্র্যাজেডি করে দিও—

আবার জিজ্ঞেস করলাম—কিন্তু কেন?

—ধরে নাও আমার শখ—আর কিছু নয় একদিন আমাকে যদি তুমি ভালবেসে থাকো, আমিও যদি তোমার কোনদিন কোনও উপকারে এসে থাকি তো আমার এ অনুরোধটা রেখো ভাই—আর তা ছাড়া "অতি-ঘরন্তী না পায় ঘর"—এ কথাটা মানো তো?

অতীতের সব ঘটনার পুনরাবৃত্তি করে আর লাভ নেই আজ। তবু বলতে পারি, দশ বছর ধরে এ-গল্পটা লেখবার জন্যে আমার চেষ্টার আর অন্ত ছিল না। বন্ধুবান্ধবের কাছে কতবার গল্প করেছি—কেউ বিশ্বাস করেছে, কেউ করেনি। কিন্তু মানুষের সংসারে চোখের সামনে জীবন সম্বন্ধে মূল্যবোধের এত পরিবর্তন দেখেছি। এত অভাবনীয় বিস্ময়ের পরিসমাপ্তি ঘটেছে এত সহজ স্বাভাবিকভাবে যে, তা বলা যায় না। তবু সাহিত্যের কারবারে এসে দেখছি আজো জীবন সম্বন্ধে আমাদের যে-ধারণাই থাক, সাহিত্যে আমরা আজো তো ফরমুলা মেনেই চলি। তাই সধবা কিরণময়ীকে শেষ পর্যন্ত পাগল করতে হয়—বিধবা রমাকে কাশী পাঠাতে হয় আমাদের। তাই--বিশ্বাস করুন মিসেস চৌধুরী—তাই আপনার অনুরোধ মতই গল্পটা শেষ করবো ভেবেছিলাম। লাবণ্যকে অধঃপতনের শেষ ধাপে নামিয়ে দিতে পারলে আমিও আপনার মতই খুশী হতাম। তাতে গল্পটা 'অতি-ঘরন্তী না পায় ঘর' এই সাধারণ প্রবাদ-বাক্যটারও একটা উদাহরণস্থল হয়ে থাকতো। জীবনে না হোক—সাহিত্যে অন্তত তাই-ই ঘটে। সেই জন্যেই তো বলছিলাম যে এ গল্পটা না লিখতে হলেই আমি খুশী হতাম!

কিন্তু আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন মিসেস চৌধুরী, আমি আপনার সম্পূর্ণ অনুরোধটা রাখতে পারলাম না।

কেন পারলাম না--তারও একটা কারণ আছে বৈকি।

সেই কারণটাই বলি। লজ্জায় ঘৃণায় ধিক্কারে আমার মাথা নিচু হয়ে এলেও আমাকে তা বলতেই হবে!

সেদিন কলকাতার বাইরে সি-পি-র একটা কোলিয়ারী অঞ্চলে যেতে হয়েছিল আমাকে। একটা লাইব্রেরীর উদ্বোধন উপলক্ষে সভাপতি পদের

সভা হলো।

সভার শেষে ভিড় পাতলা হবার পর জলযোগের ব্যবস্থা হয়েছিল ভার নিয়ে।

ওয়েলফেয়ার অফিসার মিস্টার মজুমদারের বাড়ি।

স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই ভারি অতিথিপরায়ণ। ছোট্ট বাঙলো। চারিদিকে বাগান করেছেন। ঘরটাও বেশ সাজানো। বেশ বোঝা গেল—গৃহের সর্বত্র গৃহিণীর একটি সুনিপুণ কল্যাণ হস্তের স্পর্শ লেগে আছে। চা পরিবেশন করতে লাগলেন মিসেস মজুমদার।

মিস্টার মজ্‌মদার বললেন—মিসেস মজ্‌মদার আপনার একজন ভক্ত, জানেন না বোধ হয়—ওই দেখ্‌ন আপনার সব ক'টা বই-ই কিনেছেন—

মিসেস মজ্‌মদার সলজ্জভাবে হাসতে লাগলেন। সত্যিই পাশের আলমারিতে অন্যান্য বই-এর সঙ্গে আমার বই ক'টা রয়েছে দেখে নিয়েছি আগেই।

মিস্টার মজ্‌মদার আবার বললেন—এখানকার মহিলা-সমিতিটা ওঁরই তৈরি—আর আজকে যে-লাইব্রেরীর উদ্বোধন হলো এ-ও ওঁর চেষ্টায় বলতে পারেন—সভাপতি হিসেবে আপনার নাম তো উনিই প্রথম সাজেস্ট করেন—

নিজের প্রশংসায় মিসেস মজ্‌মদার যেন বড় লজ্জিত হচ্ছেন বলে মনে হলো।

হয়ত তিনি কিছ্‌ বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু বাধা পড়লো। হঠাৎ চাকরের সঙ্গে ঘরে ঢ্‌কলো একটি পাঁচ-ছ'বছরের ছেলে। স্‌ন্দর দেহশ্রী। ছেলেটিকে চিনতে পারলাম। সভায় এই ছেলেটিই আমার গলায় মালা পরিয়েছিল। ছেলেটি ঘরে ঢ্‌কে মা'র কোলের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। বললাম—এটি আপনার ছেলে ব্‌ঝি—কী নাম তোমার খোকা?

কাছে ডাকলাম তাকে।

ছেলেটি বিশ্‌দ্ধ বাঙলায় বললে—নীলাজ মজ্‌মদার—

—নীলাজ! বড় স্‌ন্দর নাম দিয়েছেন তো—

মিস্টার মজ্‌মদার এবারো স্ত্রীর দিকে একবার চেয়ে নিয়ে হেসে বললেন—এ নামও ওঁরই দেওয়া, ও নাম দেওয়ার মধ্যেও একটা উদ্দেশ্য আছে জানেন, আমাদের দ্‌'জনের নামের প্রথম দ্‌টো অক্ষর নিয়ে—ওর নাম হয়েছে নীলাজ—

ওদের দ্‌'জনের নাম জিজ্ঞেস করা ভদ্রতাবির্‌দ্ধ হবে কিনা ভাবছি।

মিস্টার মজ্‌মদার নিজেই আমার কৌত্‌হল নিব্‌ত্তি করে দিলেন। হাসতে হাসতে বললেন—আমার নাম নিরঞ্জন, আর ওঁর নাম লাবণ্য কিনা—তাই থেকে নীলাজ—কিন্তু আপনি আর একটা সিঙাড়া নিন—কি আর একটা সন্দেশ...

আমি কিন্তু ততক্ষণ নির্বাক হয়ে দেখছি। দেখছি মিসেস মজ্‌মদারকে। এতক্ষণে তো নজরে পড়েনি। তাঁর চিব্‌কের ওপরে ডান দিকে একটা কালো তিল জ্বল জ্বল করছে।

নায়িকার জন্ম

শ্রদ্ধাস্পদেষু,—

আপনার একজন অনুরাগী পাঠিকা হিসেবে আপনাকে এই চিঠি লিখছি। আশা করি আপনার অমূল্য সময় নষ্ট করলাম বলে অপরাধ মার্জনা করবেন। একটি বিশেষ প্রয়োজনে আপনাকে আমার এই পত্র লেখা। আমার কয়েকটি বক্তব্য আছে। যদি সময় করে একদিন ওপরের ঠিকানায় দেখা করেন, বিশেষ বাধিত হবো। আপনার যে কোনও সময়ই আমার সময়। নমস্কারান্তে ইতি—

বিনীতা

কণিকা দেবী

চিঠিখানা হাতে নিয়ে শচীকান্ত কয়েকবার দেখলেন। আবার পড়লেন। পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে চিঠি যে আসে না তা নয়। শচীকান্ত নানা ধরনের চিঠি পেতেই অভ্যস্ত। এক একটা উপন্যাস বেরিয়েছে আর তার অসংখ্য পাঠক-পাঠিকার কাছ থেকে চিঠির বন্যা বয়ে গেছে। কোথায় কত দূর দূর থেকে তারা লেখে। বিনিদ্র রাত জেগে, অক্লান্ত পরিশ্রম করে এক একখানা বই লেখার পর এ-ধরনের চিঠি তাঁর ভালোই লাগে। কেউ কেউ গল্পের পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দেয়। পড়ে দেখবার জন্যে। কেউ নিমন্ত্রণ করে সভা-সমিতির সভাপতি হবার জন্যে। কেউ শুধুই অভিনন্দন জানায়। কেউ-বা উপন্যাসের সমালোচনা করে পাঠায়। কেউ তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করে। আত্ম-জীবনী লিখতে বলে। তারপর কেউ বা শুধু দেখা করবার অনুমতি চায়। শুধু শ্রদ্ধা-নিবেদন। ফুলের মালা, জয়ন্তী, বন্দনা কিছুই বাদ যায়নি। এই শহরেই শুধু নয়, সুদূরে মফঃস্বলে গিয়ে কত সাহিত্য-সভায় বাণী দিয়ে আসতে হয়েছে। এই শহরেই তাঁরই লেখা গল্প তিনটে সিনেমায় দেখানো হচ্ছে। থিয়েটারে তাঁরই একটা নাটকের আজ সপ্ততিতম অভিনয় রজনী।

কিন্তু এমন চিঠি যেন এই প্রথম।

শচীকান্তের মনে হলো চিঠির সুরটা ঠিক যেন সহজ নয়। একটি বিশেষ প্রয়োজনে যেন বাধ্য হয়ে তাঁকে চিঠি লিখতে হয়েছে।

বার বার চিঠিটা পড়লেন। সাবলীল সুন্দর হাতের লেখা। ঠিকানাটাও

এই শহরের দক্ষিণ প্রান্তের একটি রাস্তার। অর্থাৎ একদিন সুবিধেমতো দেখা করতেও আসতে পারতো। তা না করে চিঠি লিখেছে। নিশ্চয়ই কোন নিগূঢ় কথা। কিন্তু একজন অপরিচিত পুরুষ-লেখকের কাছে একজন নারীর কী এমন কথা থাকতে পারে যা চিঠিতে লেখা চলে না?

শচীকান্ত চুরুট ধরিয়ে চিঠিটা পাশের টেব্‌লে রেখে দিলেন। তারপর কাঁধের চাদরটা চেয়ারের হাতলের ওপর রেখে উঠে বারান্দায় এলেন।

রাত হয়েছে শহরে। আশে-পাশের বাড়িগুলো একটু দূরে। সব বাড়িতে এখনও আলো নেবেনি। অসংখ্য বাড়ির ঘরে ঘরে এখনও অসংখ্য নাটকের অভিনয় হচ্ছে, অসংখ্য নায়কের জন্ম হচ্ছে। কে তাব খবর রাখে। দৃষ্টির দুরধিগম্য অন্তরালে মানুষের মন এক অদ্ভুত অভিনয় কবে চলেছে। সামান্য একটু হাসির আড়ালে কী এক বিশাল লবণাক্ত অশ্রু-সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। এক অসম্বৃত আলিঙ্গনের পেছনে কি অসহনীয় ঘৃণার অস্বীকার। ইতিহাস তৈরী হচ্ছে মানুষের অজ্ঞাতসাবে। এই শহর ছাড়িয়ে, গ্রাম জনপদ অরণ্য ছাড়িয়ে সেই এক অবাঙ্‌মানসগোচর রাজ্য—যেখানে মানুষে মানুষের বিচার করে না। যেখানে মানুষ মানুষের শত্রু নয়, সেইখানকার কথাও শচীকান্ত ভাবলেন। সব ঠিক হয়ে গেছে। তাঁর নতুন উপন্যাসের পরিকল্পনা চলছে ওমনি একটা পরিসমাপ্তি দিযে। কিন্তু এবারে কে হবে তাঁর নায়িকা?

নতুন নায়িকার সন্ধানে শচীকান্ত স্মৃতির সমস্ত অলিগলি ঘুবে বেড়াতে লাগলেন।

পঁয়ত্রিশেব দুই বসন্ত সেন রোড খুঁজে বাব করতে বেগ পাবার কথা নয়। এদিকে এসেছিলেন একটা কাজে, একাজটাও সেরে যাবেন। সন্ধ্যে হয়েছে এই মাত্র।

ড্রাইভার খুঁজে খুঁজে নম্ববটা বার কবলো।

গাড়ি থেকে নেমে শচীকান্ত বাড়িটার দিকে মাথাউঁচু কবে একবার তাকালেন। সাধাবণ একটা দোতলা বাড়ি। আষ্ঠে-পৃষ্ঠের সব দরজা জানালা ভেতর থেকে বন্ধ। দক্ষিণের সমস্ত দাক্ষিণ্য থেকে এই ইচ্ছাকৃত নির্বাসন কেমন যেন বিস্ময়কর লাগলো শচীকান্তের মনে।

কড়া নাড়লেন। অনেকক্ষণ কড়া নাড়বার পর দু'জন বেরিয়ে এল। চুল উল্টানো হাফ প্যাণ্ট পরা দু'টি ছেলে। তাদের চোখের তাকানোতে যেন প্রশ্ন উথলে উঠছে।

—কাকে চাই?

শচীকান্ত সামলে নিলেন। অর্থাৎ অবারিতম্বার নিমন্ত্রণের আশা করে যেন হঠাৎ প্রবেশাধিকার না পাওয়া। কুকুরকে বরাবর শচীকান্ত ঘৃণা করেন। এ যেন দুটো বুলডগের সামনাসামনি এসে পথ ছাড়বার ভিক্ষা চাওয়া।

বললেন—কণিকা দেবী এ-বাড়িতে কেউ আছেন?

—আছেন, আপনি কে? —দুটো বুলডগ যেন একসঙ্গে ঘেউ ঘেউ করে উঠলো। শচীকান্ত ফিরেই আসছিলেন। শেষবারের মত বললেন—তিনিই আমাকে আসতে চিঠি লিখেছিলেন—তাঁকে একবার খবরটা দাও তোমরা—

দুটো বুলডগ আবার ঘেউ ঘেউ করে উঠলো—তাঁর সঙ্গে দেখা আপনার হবে না—আপনি বরং ফিরে যান—

বলে দরজার পাল্লা দুটো ঝপাং করে বন্ধ করে দিল। প্রৌঢ় শচীকান্তের নাকের সামনে এমন করে কোনও দরজা কখনও বন্ধ হয়নি। ফিরে এসে গাড়িতে বসলেন।

সব কথা গায়ে মাখলে পৃথিবীতে বাস করা চলে না। তা ছাড়া এও এক অভিজ্ঞতা বৈকি! বুঝলেন—কোথাও কোনও গোঁজামিল আছে। নইলে এত লোক থাকতে তাঁকেই বা এমন করে আহ্বান করে কেন? তাঁর শেষ উপন্যাসখানাতে অবশ্য এমনি একজন নায়িকার কাহিনী আছে বটে!

ঠিক দিন পনেরো পরে—

সন্ধ্যেবেলা বেড়িয়ে ফিরেছেন শচীকান্ত। সারাদিন নতুন উপন্যাসটা লিখেছেন। তারপর বিকেলের দিকে একটু ঘুরতে বেরিয়েছিলেন। ইচ্ছে ছিল আবার সন্ধ্যেবেলা লিখতে বসবেন। এমন সময় একজন মহিলা ঘরে ঢুকলেন। শচীকান্তের লাইব্রেরী ঘরে।

মহিলাটি একটি চেয়ারে নিজেই বসে পড়ে বললেন —নমস্কার—

নমস্কারের আদান-প্রদান হলো।

শচীকান্ত দেখলেন—সরু পাড়ের সিল্কের সাড়িটা আগাগোড়া শরীরটাকে জড়িয়েছে। কপালে সিঁদুরের টিপ্‌ও নেই, বা মাথার সিঁথিতে সিঁদুরও নেই। দোহারা চেহারার মেয়ে। হ্যাঁ মেয়েই বলতে হবে বৈকি। শচীকান্তের মেয়ে থাকলে এত বড় মেয়েই হতো। কিন্তু এই অল্প বয়সেই মাথার চুল কিছু কিছু পাকতে আরম্ভ করেছে।

শচীকান্ত বললেন—তোমাকে চিনতে পারলাম না ঠিক—

মেয়েটি বললে—আমারই নাম কণিকা—আমিই আপনাকে চিঠি লিখেছিলাম...

শচীকান্তের কপালের ওপর রেখাগুলো হঠাৎ আরও দৃঢ় হয়ে উঠলো। সোজা হয়ে উঠে বসলেন।

মেয়েটি বলে যেতে লাগলো—শুনেছিলাম আমার চিঠি পেয়ে আমাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন—এবং আমার ছেলেদের কাছে খুব রূঢ় ব্যবহার পেয়ে এসেছেন—এজন্যে আমিই দায়ী, আমি সেজন্যে আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি—

—কিন্তু ওরা কা'রা? ওই ছেলে দুটি?—প্রশ্ন করলেন শচীকান্ত।

—ওরা আমারই ছেলে—আমার সৎ ছেলে—

তারপর একটু থেমেই কণিকা বললে—আমি কারু সঙ্গে মেলা-মেশা করি, এটা আমার বড় ছেলে চায় না—তাই কারু সঙ্গে আমায় মিশতে দেওয়া বারণ আছে—আগে এমন কড়াকড়ি ছিল না তাই আপনাকে আসতে চিঠি লিখেছিলাম......

কথাটা বলবার সময় কণিকা দেবীর মুখখানা কেমন যেন পাণ্ডুর হয়ে এল। কিছুটা আতঙ্ক, কিছু লজ্জা, কিছু সঙ্কোচের জড়তা এসে কণিকা দেবীর মুখখানাকে যেন বিবর্ণ করে দিলে।

কণিকা বললে—আমাকে এক গ্লাস জল দিতে পারেন—খাবো—

জল খেয়েই কণিকা আরম্ভ করলে—যখন আপনাকে আমি চিঠি লিখেছিলাম, তখন আমার স্বামী বেঁচেছিলেন—তারপরেই একদিন মারা গেলেন হঠাৎ, তাঁর নাম বোধ হয় আপনি শুনেছেন, তিনি ছিলেন জগন্নাথ কলেজের বিখ্যাত প্রফেসার, তাঁর নাম নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, অনেকেই তাঁকে চিনতেন......

—তিনি মারা গেছেন? প্রশ্ন করলেন শচীকান্ত।

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল কণিকা। পাখার হাওয়ায় চুলগুলো উড়ছে। ঘোমটা খসে গিয়েছে। একদৃষ্টে চেয়ে আছে শচীকান্তের দিকে।

—বলো—

মেয়েটি প্রথমে একটু সঙ্কুচিত হলো। তারপর সোজা মাথা উঁচু করে বললে—আমাকে নিয়ে আপনি একটা উপন্যাস লিখুন—আমি আপনার ভবিষ্যৎ উপন্যাসের নায়িকা হতে চাই—

হঠাৎ চমকে উঠলেন শচীকান্ত। কোথায় কোন বাসনা মানুষের মনের গোপন অন্তস্তলে আত্মগোপন করে থাকে কে বলতে পারে। তিনি তো কল্পনাও করতে পারেননি এ-কথা।

কণিকা বললে—আপনার প্রথম বইটা আমি পড়েছি, সুরুচিকে অমন করে আপনি মারলেন—কিম্বা মারলেন না, ভাগ্যের ওই যে নিষ্ঠুর পরিহাস—আমার জীবনে ওই ভাগ্যবিড়ম্বনা আরও দশগুণ হয়ে জ্বলছে—কাউকে

বলবার নয়, কেউ তা দূর করতে পারে না—কেবল আপনিই পারবেন, আপনার কাছে আমি মন খুলে সব বলতে পারি—একমাত্র আপনিই তা বুঝবেন—পৃথিবীতে কেবলমাত্র আপনিই—

শচীকান্ত চুপ করে রইলেন।

কণিকা বলতে লাগলো—আপনি নিজেই দেখেছেন যে আমার জীবন কেমন জেলখানার মধ্যে কাটে, কোথাও কোনও শান্তি নেই আমার, কেউ নেই আমার—তাই আপনার কাছেই এসেছি—একমাত্র আপনিই বুঝবেন—

শচীকান্ত তখনও চুপ করে রইলেন।

কণিকা বলে যেতে লাগলো—এই যে আমার মাথার চুল দেখছেন, এই কিছুদিন আগেও এ কালো ছিল, একটাও পাকেনি—ভাদ্র মাসের তেইশ তারিখের রাত থেকে সব পাকতে শুরু করলো—আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যখন নিজের চেহারা দেখি, তখন আর চিনতে পারিনে নিজেকে—কী চেহারা আমার কী হয়েছে—যারা আগে আমায় দেখেছে তারাই শুধু জানে আমি আগে কেমন ছিলাম—আমার স্বামী দেখেছেন—আর দেখেছে সরোজ—

শচীকান্ত মুখ তুললেন। বললেন—ভাদ্র মাসের তেইশ তারিখের রাতে কী হয়েছিল—?

—সেই কথাই তো বলতে এসেছি—আমার এক অদ্ভুত জীবন—বিয়ে হবার আগে পর্যন্ত কী আনন্দেই যে কেটেছে, জানতাম না কাকে বলে কষ্ট—নিজের মন নিয়ে কখনও মাথা ঘামাইনি, কিন্তু তারপর থেকেই শুরু হলো শুধু কষ্ট আর কষ্ট—আপনি আমার জীবনী নিয়ে লিখুন, দেখবেন ভালো হবে, আপনার অন্য বই-এর চেয়েও ভালো হবে......

শচীকান্ত দেখতে লাগলেন মেয়েটিকে। যত বয়স মেয়েটির তার চেয়ে বেশীই দেখাচ্ছে অবশ্য। কিন্তু চোখ দুটো কী উজ্জ্বল! স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য কিনা কে জানে। হয়ত ভেতরের জ্বালা বাইরে আত্মপ্রকাশ করছে চোখের ভেতর দিয়ে। এতক্ষণ কার সঙ্গে বসে বসে কথা বলছেন! মেয়েটি কি অপ্রকৃতিস্থ! হঠাৎ কোনও সুযোগ পেয়ে বাড়ি ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। এতক্ষণ হয়ত চারিদিকে খোঁজ পড়ে গেছে। কে জানে!

মেয়েটি যেন শচীকান্তের চিন্তাধারা বুঝতে পারলে। বললে—আমাকে হয়তো আপনি পাগল ভাববেন—পাগল আমি নই, কিন্তু পাগল হয়ত হয়েও যেতে পারি এর পর—

হঠাৎ এক অভাবনীয় কান্ড করে বসলো মেয়েটি!

বললে—আপনি আমার বাবার মত......

বলেই পিঠের দিকের ব্লাউজটা তুলে শচীকান্তের দিকে ফিরে দাঁড়াল।

বললে—দাগ দেখতে পাচ্ছেন? লম্বা লম্বা ঘায়ের মত দাগ.....পিঠময় দাগ. ....ফোলা ফোলা......

শচীকান্ত চোখ বুজলেন—

কণিকা মুখ সোজা করে আবার গায়ের শাড়ি ঠিক করে বসলো। বললে- এসব মারার দাগ, আমায় মারে—আমার বড় ছেলে আমায় মারে, আপনি বিশ্বাস করুন—

শচীকান্ত বিশ্বাস করলেন কিনা, কণিকা একদৃষ্টে তাই দেখতে লাগলো।

খানিক পরে বলে উঠলো—লিখবেন আমাকে নিয়ে—লিখবেন—?

শচীকান্ত আর একটা চুরুট ধরালেন। পোড়া কাঠিটা ফেলে দিয়ে অনেক ধোঁয়া ছাড়লেন মুখ দিয়ে। তারপর আবার টানলেন, আবার ধোঁয়া ছাড়লেন। কণিকা বৃথাই শচীকান্তের মুখের দিকে চেয়ে উদগ্রীব হয়ে চেয়ে রইল। তবু শচীকান্ত চুপ করে বসে রইলেন শুধু।

কণিকা এবার আর এক কান্ড করে বসলো। কোমরের আঁচল থেকে হঠাৎ একটা সোনার বালা শচীকান্তের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে—আপনাকে আমি এইটে দিলাম, আমার আর নিজের বলতে কিছু নেই—এই কয়েকটা গয়না ছাড়া, তাও নেবার জন্যে দিনরাত ষড়যন্ত্র চলছে, লুকিয়ে লুকিয়ে রাখি- তা এইটে আপনাকে আমি দিলাম—

শচীকান্ত এবার বললেন—ওর দরকার হবে না, তোমার আঁচলেই বেঁধে রাখো—বলো, তোমার কাহিনী—শুনি—

কণিকা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো যেন। বললে—শুনবেন তা হলে—শুনুন। কণিকা শুরু করলো।

জগন্নাথ কলেজে প্রফেসরী করতেন বাবা। কণিকা সেইখানেই মানুষ। ইতিহাসের অধ্যাপকের মেয়ে, একমাত্র মেয়ে। আকাশের চাঁদ চাইলে চাঁদ পেত তখন। কণির জন্যে নিশানাথ সমস্ত করতে পারতেন। আকাশই বা কী আর সমুদ্রই বা কী! সেই কণিকা বাবার স্নেহে, প্রতিবেশীর প্রীতিতে, মাস্টারদের মমতায় বেড়ে উঠলো। ক্লাশের পরীক্ষায় ফার্স্ট হওয়া, আর সাঁতারে, সেলাই-এ, খেলায়-ধুলোয় ফার্স্ট হওয়া এ ওর একচেটে। মানুষের সংসারে কতজনই তো কতভাবে লোকের শ্রদ্ধা প্রীতি পায়, কিন্তু সে-পাওয়াই যে চিরজীবনের মত পাওয়া, শেষ পাওয়া, তাই বা কে জানতো! নইলে দর্শনের প্রফেসর নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের হঠাৎ পত্নী বিয়োগই বা

হবে কেন! আর নিশানাথ আর নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কি আলাদা মানুষ! অমন বন্ধুত্বও তো দেখা যায় না আজকাল। কণিকে যিনি পড়িয়েছেন, যাঁকে কাকাবাবু বলে ডেকেছে কণি, সেই নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—দর্শনের অধ্যাপক।

বাবা বলতেন—কণির বিয়ে দেব কলকাতায়।

বন্ধু বলতেন—কণির বিয়েতে যত নুন খরচ হবে—সব দেব আমি -

বাবা হাসতেন—বন্ধুও হাসতেন। কণিকাও হাসতো।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কণিকার জন্মদিনে সবচেয়ে দামী উপহারটা আসতো তাঁরই কাছ থেকে। একবাব দিয়েছিলেন তিন শো টাকা দামের একটা জড়োয়া নেকলেস। ছোটবেলায় দিয়েছিলেন একটা সাইকেল। একবার দিয়েছিলেন সেলাই-এর কল। বছরে বছরে যে কত জিনিস জমা হতো তা বাবা জানতেন।

বাবা বলতেন—অমন বন্ধু হয় না রে, অমন মানুষ আর দেখি না—ও বড় নিঃসঙ্গ, সব থেকেও কেউ নেই ওর—ও যেন বনস্পতি, ঝড় ঝাপটা সব নিজের মাথায় টেনে নেয়, পবের আঘাত লাঘব হবে বলে—ও নিজে ছাড়া আব সবাই ওব পর, কিন্তু পরকে এমন আপন করতেও আর কাউকে তো দেখিনি

বাবা আরও বলতেন—তোর মা যখন মারা যায় কণি, তখন আমার দুঃখটা আর কী, শ্মশান থেকে ফিরে সেই যে নরেন বাড়ি ফিবে গেল তিন দিন ঘরের দরজাও খোলেনি, কারু সঙ্গে দূরের কথা আমার সঙ্গেও একটা কথা বলেনি - আমার শোকে ও এমনি শোক পেয়েছিল—

সেই কাকাবাবুকে কণিকা যখন দেখতো, যখন তিনি আদর করতেন কণিকাকে, তখন তিনি ছিলেন সত্যিই আদর্শ পুরুষ। সত্যিই যাকে বলে আজানুলম্বিত বাহু, গৌরবর্ণ দেহ আর বিপুল জ্ঞানের খনি। ছাত্রমহলে কী তাঁর সুখ্যাতি। সমস্ত শহরে তিনি আব বাবা ছিলেন সকলের শ্রদ্ধা আর ভক্তির পাত্র। সেই কাকাবাবু কী কুক্ষণেই যে একদিন নিশানাথের মত বিপত্নীক হলেন - সেই দর্শনের অধ্যাপক নবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। কাঁদলেন না, হা-হুতাশ করলেন না। তাঁর দর্শন তাঁকে শিখিয়েছিল স্থিতধী হতে। একেবারে সহজ স্বাভাবিক করে নিলেন স্ত্রীর মৃত্যুকে। আকণ্ঠ শোককে তিনি অপূর্ব স্থৈর্য দিয়ে আত্মস্থ করে শোকের ঊর্ধ্বে উঠলেন। বন্ধু-পত্নীর মৃত্যুতেও যিনি কাতর হয়েছিলেন তিনি এবার নিজের স্ত্রীর মৃত্যুতে শোকাতীত হয়ে গেলেন।

নিশানাথ বললেন—আবার বিয়ে করো নরেন—

নরেন বললেন—বলো কি—

—ঠিকই বলি, তুমি আবার বিয়ে করো—

প্রায় প্রত্যেকদিনই এইরকম।

নরেন্দ্রনাথ বললেন—তা হলে তুমি করনি কেন?

নিশানাথ কী ভাবলেন। বললেন—তুমি দার্শনিক, আর আমি ঐতিহাসিক—আসলে তো আমরা দুজনে আলাদা—

নরেন্দ্রনাথ বললেন—মানুষের বয়েস দর্শনের তোয়াক্কা রাখে না—

—তাহোক বয়েসটাই সব তা আমি মানিনে—তা ছাড়া তোমার ছেলেরা ছোট ছোট—তোমার তো মেয়ে নেই, মেয়ে থাকলে আমি বলতাম না, আর আমার মেয়ে—একমাত্র মেয়ে রয়েছে যে—

প্রায়ই দুই বন্ধুর দেখা হলেই এইসব আলোচনা। নিশানাথ একদিন বললেন—তোমার দর্শন তোমার জীবনকে বাদ দিয়ে তো নয়—জীবনের জন্যেই দর্শন—সেই জীবনকেই তুমি অস্বীকার করেছো নরেন—

দর্শনের অধ্যাপক কী দিগ্‌-দর্শন পেলেন কে জানে। বললেন—আমাকে মেয়ে দেবে কে?

—কেন? আমি দেব—কণিকে বিয়ে করো—

বাবার কথা শেষ হলো না, নরেন্দ্রনাথ হো হো করে হেসে উঠলেন। কণিকাও হেসে উঠলো। হাসলেন না কেবল নিশানাথ। সেই নরেন্দ্রনাথের সামনেই মেয়েকে বললেন—নরেনকে যদি স্বামী পাস, সে তো তোর বহুজন্মের তপস্যার ফল রে—কী বল, কিছু অন্যায় বলেছি—তোমার মনটা স্থির করো আগে—ওর জন্যে তোমার ভাবতে হবে না—কণি তো আমারই মেয়ে—

প্রথমে কথাটা হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথ। কিন্তু সে বুঝি শুধু মুখেরই হাসি। বিয়ের দিন নিশানাথ বললেন—শুধু বন্ধুকৃত্য করলাম ভাবিসনে মা, আমি তোর ভালো হবে জেনেই করেছি—

বাবার পায়ে হাত দিয়ে কণিকা প্রণাম করে বললে—তা আমি জানি বাবা।

কিন্তু বাবার অনেক সৌভাগ্য যে তাঁকে বেঁচে থেকে কিছুই দেখতে হলো না। কয়েকদিন পরেই নিশানাথ নিশ্চিন্ত মনে মারা গেলেন। কণিকা বড়লোকের ঘরে পড়েছে, অগাধ সম্পত্তির মালিক সে। কলকাতাতেই চারখানা বাড়ি নরেনের। নিশানাথ নিজের সমস্ত সম্পত্তি এক মিশনে দান করে গেলেন।

বিয়েটা যেমন ঘটলো আকস্মিক—তারপরের ঘটনাটাও তেমনি আকস্মিক ভাবেই ঘটলো।

আবিষ্কার করলো কণিকা ফুলশয্যার রাত্রেই কিন্তু সন্দেহটা ঘুচতে লাগলো আরো কয়েকটা দিন, আরো কয়েকটা মাস।

যে নরেন্দ্রনাথ ছিলেন বাইরে দার্শনিক পণ্ডিত, নিশানাথের বন্ধু, কণিকার কাকাবাবু, সেই নরেন্দ্রনাথের আর এক রূপ কণিকা তাঁর অঙ্কশায়িনী না হলে তো জানতে পারতো না। এ জানা যে নির্মমভাবে জানা। তার সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে জানা—তার বর্তমান ভূত ভবিষ্যৎ দিয়ে জানা।

বিয়ের সাতদিন পরেই নরেন্দ্রনাথ বুঝতে পারলেন।

একদিন বললেন—কলকাতার তিনটে বাড়িই তোমার নামে লিখে দিলাম কণি—তাছাড়া আমার নগদ টাকাকড়িও কম নেই—নবদ্বীপে দশ বিঘে জমি—কেষ্টনগরের আঠারো বিঘের ওপরে বাগান—আর আলমারীর চাবি এই নাও—সত্তর ভরির মত গয়না এখনো আছে ওতে—আর চারটে ব্যাঙ্কের পাশ বই।

দশদিন পরে আবার বললেন—বসতবাড়িটাও তোমার নামে লিখে দিলাম কণি, আমার অবর্তমানেও তো আমার ছেলেদের তুমিই দেখবে।

সেবার পুজোর দশদিন আগেই নরেন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে অর্ডার দিয়ে আনিয়ে দিলেন মুক্তোর হার।

সেবার গরমের ছুটিতে কী খেয়াল হলো কণিকে নিয়ে গেলেন পুরীতে।

সেই দার্শনিক পণ্ডিত দু'হাতে টাকা খরচ করতে লাগলেন কেন যে কে জানে! এ সবের পরেও আছে বক্তৃতা আর উপদেশ—এই রক্তমাংসের শরীরটাই যেন সব তা ভেবো না কণি—এই নশ্বর শরীর—এর ক্ষয় আছে, লয় আছে,—কিন্তু আমাদের মন যেমন চিরতরুণ, যেমন অক্ষয় অব্যয়—এই আমাদের মন এই ব্রহ্মাণ্ডের চরমতম বিস্ময়—

সব কথা কি কানে যেতো। যত শুনতো তত ঘৃণা হতো। স্বামীর সান্নিধ্যই কণিকার মনে বিতৃষ্ণা জাগিয়ে তুলতো। বিগতযৌবন বৃদ্ধ দার্শনিক স্বামী! কণিকার মনে হোত এর চেয়ে ঘৃণ্য এ পৃথিবীতে আর কিছু নেই।

কিন্তু কণিকা বাবার কথা স্মরণ করে মুখে হাসি আনতো। এক শয্যায় শুতো। ছেলেদের ভালবাসতো। তার কাছ থেকে আর কী আশা করা যেতে পারে?

তারপর চাকরি থেকে রিটায়ার করে স্বামী এলেন কলকাতায়। সপরিবারে কলকাতার বাড়িতে। প্রচুর অর্থের সঙ্গে সংসারের কর্ত্রী হয়েও কোথায় যেন এক ফাঁক ছিল কণিকার মনে। এমন সময় সরোজ এল।

এল সরোজ আর জীবনে এল জটিলতা।

এক বিয়ের-বাড়ির হট্টগোলের মধ্যে সরোজকে প্রথম দেখলে কণিকা। কিম্বা বলা যায় সরোজ দেখলে কণিকাকে। বিয়ের-বাড়ির লোকজনের

কোলাহলের ভেতর পেছল সিঁড়ি দিয়ে নামতে হঠাৎ পা পিছলে পড়েই যেত কণিকা, কিন্তু সামনে থেকে যে ধরে ফেললে সে-ই তো সরোজ। ছাব্বিশ বছরের ছেলে—কিন্তু কী চওড়া বুক আর হাতের কব্জির কী জোর! কণিকারই সমবয়সী বা দু'এক বছরের ছোট হবে।

—লাগলো নাকি আপনার? জিজ্ঞেস করলে সরোজ।

—না লাগেনি—বলে সোজা হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে দাঁড়াতে পারলো না। সত্যিই পায়ে লেগেছিল বেশ।

সে রাত্রে ট্যাক্সী করে বাড়ি পেঁৗছে দেবার ভার নিয়েছিল সরোজই।

'শেষের কবিতা'র মোটর-দুর্ঘটনা আর 'গোরা'র ঘোড়ার গাড়ির দুর্ঘটনা—তার সঙ্গে এই বিয়ে-বাড়ির দুর্ঘটনা—এ তিনের মধ্যে কোনও তফাৎ তো নেই। আর সেই সরোজ, যদি পরের দিন আবার দেখা করতে আসে কণিকার ভালমন্দ নিয়ে, তাতে কি দোষ দেওয়া যায়!

সরোজ বললে—কী ওষুধ দিচ্ছেন পায়ে?

—কিছুই না—বিছানায় শুয়ে কণিকা বললে।

কিন্তু সামান্য ব্যাপার বলে অবহেলা করবেন না, জানেন তো সামান্যই একদিন অসামান্য হয়ে উঠতে পারে—

তারপর থেকে রোজ আসা। খোঁজখবর নেওয়া। সরোজের তখন সময় যথেষ্ট। ছাত্র-জীবন শেষ হয়ে গেছে—ওদিকে চাকরিও করে না। হাতে তার টাকা না থাক—অবসর আছে প্রচুর। কণিকার পা একদিন ভালো হয়ে গেল—কিন্তু সরোজের দেখা করা বন্ধ হলো না। দেখা করার ব্যবস্থা হলো বাড়ির বাইরে। রাস্তায়, পার্কে, রেস্টুরেণ্ট-এ—সর্বত্র। কণিকার টাকা আছে, আর সরোজের আছে স্বাস্থ্য। দু'জনের স্বপ্ন-রঙিন সেই কাহিনী, অমিত-লাবণ্যের সেই স্বর্গ-রচনা দিনের পর দিন বছরের পর বছর চলতে লাগল অব্যাহত অবাধগতি। স্বামীর আর ছেলেদের দৃষ্টির আড়ালে, বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে যাবার অছিলায় সরোজের সঙ্গে গিয়ে দেখা করা আর তারপর অনেক রাত করে বাড়ি ফেরা। অনেক রাত—তখন সকলের খাওয়া-দাওয়া শেষ করে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ার কথা।

স্বামী যেদিন জেগে থাকতেন, বলতেন—খেলে না আজকে?

—খেয়ে এসেছি—বলতো কণিকা।

তার বেশি জিজ্ঞেস করার সাহস ছিল না স্বামীর। তারপর ঘুমের ঘোরে কারুর বেশি কথা বলার প্রয়োজন হবার কথা নয়। নরেন্দ্রনাথের পাশে এক বিছানায় শুয়ে কণিকা ভাবতো অন্য কথা। অর্থাৎ সরোজের সান্নিধ্য, এক রিক্সায় পাশাপাশি বসা আর তার সঙ্গে গল্প করতে করতে সমস্ত পৃথিবী, সংসার, সব ভুলে যাওয়া।

একটা দিনের কথাই ধরা যাক। বেড়াতে বেড়াতে ট্রেনে চড়ে একেবারে হুগলী চলে গেছে। অর্থাৎ কলকাতার সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। স্টেশনে নেমে একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে ইমামবাড়া দেখা আর গঙ্গার ধারটিতে গিয়ে নিরিবিলি বসা। আর তারপর যখন দুপুর নির্জন হয়ে এলো, হুগলীর রাস্তায় নিঃঝুম নিরিবিলি নেমে এলো, তখন দুজনে গিয়ে ঢুকলো সেই ফাঁকা গীর্জায়। সেই গীর্জার সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেখানে ঘনিষ্ঠ হয়ে এসেছে অলিন্দের আর্চগুলো, সেই সিঁড়ির চূড়োয় গিয়ে বসলো দুজনে। ছাই ছাই অন্ধকার ....দুপুরের ঝাঁঝ আসে না কাছে, অথচ চারিদিকে অবাধ স্বাধীনতা। ওই সব জায়গাই বুঝি মন দেওয়া নেওয়ার পক্ষে প্রশস্ত।

সারাক্ষণ সরোজ কী বলেছে তার প্রলাপ হয়ত একটাও কানে যায়নি। কিম্বা কিণকাও যা বলেছে তাই কি সে কোনদিন বলবে ভেবেছে নাকি? দুজনের সেই কানাকানি, সেই কথা বলার ছন্দ সেই গীর্জার চত্বরে, ছাদে, গম্বুজে এখনও আজও হয়ত প্রতিধ্বনিত হয়। প্রত্যেকটি শ্বেতপাথরের ইটে হয়ত তার ছাপ লেগে আছে আজও।

সরোজ সেইখানে বসেই বলেছিল মনে আছে –চলো কণি আমরা পালিয়ে যাই—

প্রলাপকে কে বিশ্বাস করে! কণিকা সে কথার উত্তর দেয়নি সেদিন।

সরোজ বলেছিল—প্রতি পলে পলে মৃত্যুর চেয়ে চলো একেবারে মরে যাই—

সরোজের যন্ত্রণাটা অনুভব করতে পারতো কণিকা। বেচারির জীবনে হয়ত কণিকার মতই একটি মেয়ের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সরোজ সেই এলো, শুধু ক'বছর আগে এলেই পারতো। এই যে সরোজের সঙ্গে দিনের পর দিন মেলামেশা করা এ যে অন্যায় তা বুঝতো কণিকা। কিন্তু ওইটুকুই যা, আসলে কণিকা তো জানতো কোনও অন্যায়ই তার দ্বারা সম্ভব নয়। অতি ঘনিষ্ঠ হয়েও কণিকা নিজের সত্তা বজায় রেখেছে চব্বিশ ঘণ্টা। বাবার কথাব মূল্য সে দিয়েছে, স্বামীকে সে প্রবঞ্চিত করেনি।

তবু স্বামী একদিন টের পেয়ে গেলেন।

এই গোপন মেলামেশা একদিন তাঁর কানেও পেঁছুল। শুধু কানেই পেঁছুল, কিন্তু কিছু বললেন না মুখে। কেমন করে কে তাঁর দরবারে খবর দিলে, তা কণিকা জানে না। সরোজের লেখা চিঠি তাঁর হাতে পড়েই যাক, অথবা তাঁর বড় ছেলে তাঁর কানেই তুলুক—ব্যাপারটা স্বামীর কানে এসেছে, এটা টের পাওয়া গেল। বড় ছেলেকে ডেকে নরেন্দ্রনাথ বললেন—ভুল ত্রুটি সকলেরই থাকে, তোমার আমারও আছে, কিন্তু সে ভুল সমালোচনা

করবার অধিকারই কি সকলের থাকে—তা ছাড়া এত বয়স হলো, বাইরের চোখ কান দু'টোই যে সত্যি এমন কথা আজও হলফ করে বলতে পারিনে—বরং......

কণিকা রাত্রে ফেরার পর স্বামী বললেন—বুদ্ধি শুদ্ধি ভগবান আমাকে বেশি দিয়েছেন, আর তোমাকে দিয়েছেন কম, এমন কথা বলবো না, কিন্তু তোমাকে বলেই বলছি—বুদ্ধিভ্রংশ হলে মানুষ যা করে তুমি যেন তা করো না—তাহলে তুমি আমি ছাড়া আর একজন যে আঘাত পাবে সে তোমার স্বর্গত বাবা......

কণিকা বুঝতে পারলে তাদের ঘিরে তার সব ছেলেরা কেমন এক ষড়যন্ত্র বাধাচ্ছে। কিন্তু কণিকা জানতো স্বামী আছেন তার পক্ষে। সমস্ত ঝড়-ঝাপটা থেকে রক্ষা করার সময় তাঁর সাহায্য সে পাবেই। কিন্তু অবস্থা যখন ক্রমেই ঘোরালো হয়ে আসছিল, একদিন কণিকাই সব ভেবেচিন্তে সরোজের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিলে। মৃত্যুই যখন তার বিধান, তখন অর্ধমৃত হয়ে বাঁচবার চেষ্টা কেন? একদিন বাবার মুখ চেয়ে কণিকা বৃদ্ধ নরেন্দ্রনাথকে স্বামিত্বে বরণ করেছিল আর আজ স্বামীব মুখ চেয়ে সরোজকে ত্যাগ করতেও বাধলো না তার।

কিন্তু দুর্দৈব কি তবুও সত্যিই এড়ান যায়।

ভাদ্র মাসের তেইশ তারিখের রাত্রে দার্শনিক নরেন্দ্রনাথ দর্শনাতীত ধামে চলে গেলেন। আর সেই রাত্রেই প্রকাশ হলো কণিকাব পরলোকগত স্বামী তাঁর সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি থেকে তাকে বঞ্চিত করে ছেলেদের নামে নতুন উইল করে গেছেন।

স্বামীর মৃত্যুতে শোক পেয়েছিল কি না এখন আব মনে নেই—একটু কাতর হয়েছিল বৈ কি! কিন্তু সেকি শোকে, না দুর্ভাবনায় না নিজের নিঃসহায়তায়! কে বলবে!

তারপব বাবা, বাবাব সম্পত্তি, স্বামী, স্বামীর সম্পত্তি সমস্ত থেকে বঞ্চিত হয়ে কণিকা নিষ্করুণ পৃথিবীর মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে নিরবলম্ব শরীরটা নিয়ে। এখন কোথাও কোনও আশ্রয় নেই তাব। কোনও অবলম্বন নেই। শুধু এই ব্যর্থ জীবনটা আছে আর আছে তার ব্যর্থতার ইতিহাস। সেই একমাত্র মূলধন নিয়ে সে এসেছে শচীকান্তেব কাছে। তার জীবন নিয়ে। তাকে কেন্দ্র করে যদি শচীকান্ত উপন্যাস লেখেন তবে আবার সে সার্থক হয়ে উঠবে—মহৎ হয়ে উঠবে—নায়িকা হয়ে উঠবে—

কণিকা গল্প শেষ করে চুপ করে রইল।

উদ্‌গ্রীব আগ্রহ নিয়ে শচীকান্তর মুখের দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে। শচীকান্ত মুখ নিচু ক'রে বসেছিলেন। কণিকাই প্রথম প্রশ্ন করলো—শুনলেন?

—হ্যাঁ শুনলাম—বললেন শচীকান্ত।

কেমন লাগলো?

শচীকান্ত কোনও উত্তর করলেন না।

কণিকা বললে—এমন করে সর্বস্ব হারিয়ে বেঁচে থাকা, এমন করে সব থেকেও সমস্ত হারানো এমন করে আত্মত্যাগ করা আপনি আর কারো জীবনে দেখেছেন? আপনার সমস্ত বইগুলোই আমি পড়েছি......কতবার ভেবেছি তারা আমার কথাই বুঝি শেষ পর্যন্ত বলবে—কিন্তু......

খানিক থেমে কণিকা আবার বললে—আমার এই জীবনটা নিয়ে লিখুন, আরো যা যা জিনিস আপনার দরকার সব আমি দেখাবো আপনাকে, আমার বিয়ের পর আমাকে লেখা বাবার সব চিঠি, বাবার কাছে যাবার পর আমার স্বামীর সব চিঠি, স্বামীকে লেখা আমার চিঠি আর তারপর সরোজের লেখা পাঁচশো চিঠি—সব আপনাকে আমি দিয়ে যাব একদিন, আপনি এক এক করে পড়ে দেখবেন, অনেক জিনিস পাবেন তাতে—

শচীকান্ত উঠে বসলেন। বললেন—দেখ, তোমার জীবন নিয়ে ঠিক গল্প হবে না—

কণিকা হঠাৎ যেন এক মুহূর্তে নিবে গেল।

বললে—কেন?

শচীকান্ত মৃদু হাসলেন এবার। কিন্তু উত্তর দিলেন না।

কণিকা বললে—আমার জীবন নিয়ে যদি গল্প না হয়, তবে কার জীবন নিয়ে হবে?

শচীকান্ত বললেন—তোমার জীবনে গল্পের সব আছে সত্যি কিন্তু পরিণতি নেই—পরিণতি মানে ইংরেজীতে যাকে বলে ক্লাইমেক্স—অর্থাৎ সমস্ত ঘটনা যে চূড়ান্ত পরিণতিতে গিয়ে পৌঁছোয়—তুমি নিজে লেখিকা হলে বুঝতে তোমার এই কাহিনীতে সেই পরিণতির অভাব!

কণিকা বললে—আমার জীবনে যা ঘটেনি, তা কেমন করে বলবো—যা ঘটেছে তাই বললাম—

—তাতে তো হবে না, জীবনের সত্য সাহিত্যের সত্য নয়—আর সাহিত্যের সত্যও জীবনের সত্য নয়—তোমার জীবন জীবন হিসেবেই সার্থক, সাহিত্যে তার কোনও মূল্যই নেই তা সে যত দুঃখেরই হোক আর যত সুখেরই হোক।

কণিকা যেন শচীকান্তর অকাট্য যুক্তিতে একেবারে নিরুত্তর হয়ে গেল।

—কিন্তু এক কাজ করলে তোমার জীবন নিয়ে উপন্যাস লেখা চলতো, আর একটা চমৎকার পরিণতিও পেত তোমার কাহিনী—শচীকান্ত বললেন।

—কী ?—শেষ সম্বল হিসেবে কণিকা আর একবার কৌতূহলে সজীব হয়ে উঠলো।

—যদি তুমি সরোজের সঙ্গে পালিয়ে যেতে, তবেই তোমার চরিত্রে একটা বৈচিত্র্য আসতো আর সে উপন্যাসের নায়িকা চরিত্রের মেরুদণ্ড থাকতো।

কথাগুলো বলবার সময়ে শচীকান্তর চোখ দু'টো কেমন কৌতুকোজ্জ্বল হয়ে উঠলো। কণিকা তা লক্ষ্য করলে না। তবে কি শচীকান্ত পরিহাস করছেন ? না কণিকাকে তিনি তাঁর নিজের পছন্দমত নায়িকায় পরিণত করে নিতে চাইছেন ?

কণিকা বললে—আমাকে তো কতবার সরোজ পালিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল—কেবল আমিই যাইনি !

—সেইটেই ভুল করেছ—পালালে তোমাকে গল্পের নায়িকা করা যায়।

শচীকান্ত কথাটা বলে স্নিগ্ধ এক রকম হাসি হাসতে লাগলেন। কণিকা আপন মনের গভীরে যেন চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। খানিক পরে উঠলো। বললে—দেখি, সরোজকে গিয়ে আবার বলিগে যাই—

শচীকান্তের মনে হোল কণিকা যেন স্বগতোক্তি করলে। তারপর কণিকা চলে যাবার পর শচীকান্ত লিখতে বসলেন যথারীতি। লিখতে লিখতে হঠাৎ নায়িকার জন্মদাতা আর একবার হাসলেন। সেই স্নিগ্ধ কৌতুকোজ্জ্বল হাসি।

আবার হঠাৎ একদিন কণিকা এল।

শচীকান্ত বাড়ি ছিলেন না। বেড়িয়ে ফিরে এসে দেখলেন কণিকা বসে অপেক্ষা করছে তাঁরই লাইব্রেরী ঘরে। কাঁধের চাদরটা চেয়ারে নামিয়ে রাখতে রাখতে শচীকান্ত বললেন—কী খবর তোমার—

কণিকা বললে—সরোজ রাজী হয়েছে—তবে......

একটু থেমে আবার বললে—তবে একটু অসুবিধেও আছে—বলে যেন নিবে গেল কণিকা।

শচীকান্ত বললেন—কিসের অসুবিধে ?

—সরোজের বড় ছেলের ক'দিন থেকে একটু জ্বর হয়েছে, আজকে প্রায় একশো তিন উঠেছে-জ্বরটা একটু ভালোর দিকে এলেই আমাকে নিয়ে পালিয়ে যাবে—মিছিমিছি শুধু কয়েকদিন দেরি হয়ে গেল—

শচীকান্ত জিজ্ঞেস করলেন—তোমার স্বামীর মৃত্যুর পরও তোমাদের দু'জনের আগেকার মত ঘন ঘন দেখা হয় ?

—তেমন ঘন ঘন দেখা হয় না, ওরও তো এখন সংসার ঘাড়ে পড়েছে, ছেলেমেয়ে হয়েছে, দায়িত্ববোধ এসেছে, তেমন দেখা না হলেও আমি সময় পেলেই দেখা করি।

তারপর একটু থেমে আবার বললে—সরোজ কখনও মিথ্যে বলে না, ও যখন রাজী হয়েছে, তখন কথা রাখবেই, বাজে কথা মন-রাখা-কথা বলবার মানুষ নয় ও—দেখবেন আপনি, ওর ছেলের অসুখটা কমলেই চলে যাবো আমরা—

কণিকা চলে যাবার অনেকক্ষণ পরেও শচীকান্ত হাসলেন। লেখকের অজ্ঞাতসারে কোন্ চরিত্র কী রূপ নেয় কে বলতে পারে। নায়িকা নিজেই নিজের চরিত্র তৈরী করছে। শচীকান্ত ভেবেছিলেন এক, আর ঘটছে অন্যরকম। তিনিই কি জানতেন এমন হবে!

কিছুদিন পরেই আবার এল কণিকা।

শচীকান্ত বললেন—কী খবর তোমার?

কণিকা বললে—অনেক বাধা আসছে, সরোজের ছেলের অসুখ ভালো হয়ে গেছে, কিন্তু ওর স্ত্রীর পায়ে কী একটা ব্যথা খুব বেড়েছে, হাঁটতে পারছে না ক'দিন থেকে, ...সেইটে কমলেই যাবে বলেছে—সরোজ মন-রাখা কথা বলবার লোক তো নয়—দেখবেন আপনি শেষ পর্যন্ত ও ঠিক কথা রাখবে—

কণিকা চলে যাবার পর সেদিনও একটা পরিচ্ছেদ লিখলেন শচীকান্ত। লিখতে লিখতে সেদিনও হাসলেন। বিধাতা নিজের সৃষ্টি দেখেও নাকি চমকে উঠেছিলেন একদিন। এ তো সামান্য নায়িকা। আর শচীকান্ত তো একজন শিল্পী মাত্র।

শচীকান্ত বাড়িতেই অপেক্ষা করছিলেন সেদিন। কণিকা এল।

শচীকান্ত বললেন—তুমি একলা, সরোজ কই? লিখেছিলে যে সরোজও সঙ্গে আসবে?

হাতের জিনিসগুলো কণিকা মেঝের একপাশে সরিয়ে রাখলে। একটা ছোট এটাচি কেস। আর কয়েকটা জামা-কাপড় নিয়েছে খবরের কাগজে মুড়ে। অনেকদূর যাবার জন্য যেন প্রস্তুত হয়ে এসেছে। আজ শাড়িতে

ব্লাউজে তার ঘর বাঁধার ছন্দ। দেখলেই বোঝা যায়, এতদিনে তার সমস্ত সাধ আর সাধনার চরম লক্ষ্য মিলে গেছে। কিন্তু সে আনন্দের পেছনে কি শুধুই নায়িকা হওয়ার স্বপ্ন-সম্ভাবনা না এক পুরোন ঘর ছেড়ে নতুন ঘর বাঁধবার সার্থকতাও উঁকি মারছে।

কণিকা আজ বড় ব্যস্ত বোঝা গেল। একবার রুমাল খুলছে, আবার গেরো দিচ্ছে। নিজের লুকোন কয়েকখানা গয়নাও এনেছে।

বললে—সরোজ আমার সঙ্গেই আসছিল, হঠাৎ বড়বাজারে একটা কাজ সেরে আসবে বলে নেমে গেল, আধঘণ্টা পরেই আসছে—

ব্লাউজের ওপর থেকে ভেতরে হাত চালিয়ে দিয়ে দু'খানা রেলের টিকিট বার করলে কণিকা। বললে—দেখুন, সরোজ এই টিকিট দু'খানাও কিনে দিয়েছে।

আধঘণ্টা পরে সরোজ আসবে। তারপর দু'জনে কোন এক সুদূরগামী ট্রেনে চেপে বসবে। শচীকান্ত একবার ঘড়ির দিকে তাকালেন। সাড়ে ছ'টা বেজেছে এখন। সরোজ আসবে সাতটার সময়।

কণিকা আর একবার উঠে এটাচি কেস্‌টা খুললো, কী যেন বার করলো কী যেন ভেতরে রাখলো, তারপর আবার উঠে এসে বসলো।

বললে—উপন্যাসটা লিখতে আপনার ক'দিন লাগবে সময়। যদি কোনও কাগজে বেরোয় তাহলে তো জানতেই পারবো—আর তা নয় তো—

কণিকা নায়িকা হতে পেরেছে। সমস্ত অতীত জীবনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পেরেছে এ আনন্দ সে রাখবে কোথায়!

হঠাৎ পেছন ফিরে ঘড়িটা দেখেই চমকে উঠেছে। সাতটা বেজে গেছে! নিজের মনেই যেন কণিকা বললে—এখনও আসছে না, তা সে আসবে ঠিক—

শচীকান্ত সামনের চেয়ারে বসেছিলেন। বললেন—এ ঠিকানা খুঁজে পাবে তো সরোজ?

কণিকা বললে—একদিন সরোজকে নিয়ে এসে আপনার বাড়ি দেখিয়ে গেছি যে, আপনি বাড়ি ছিলেন না।

তারপর আরও অনেকক্ষণ কাটলো। বাজলো আটটা। এখনও এল না। তবে কি আজ যাওয়া হবে না তাদের!

ন'টা বাজলো।

শচীকান্ত মৃদু হাসলেন। বললেন—এখনো যে এল না সরোজ।

—আসবে সে ঠিক—বোধ হয় কোনও কাজে আটকে পড়েছে।

দশটা বাজলো।

শচীকান্ত বললেন—এখনও যে এল না সরোজ—

—আসবে সে ঠিকই, হয়ত ট্যাক্সি করে এসেই হাওড়া স্টেশনে নিয়ে যাবে —এক মিনিট কথা বলবার সময় থাকবে না।

মাঝখানে কণিকার জন্যে কিছু খাবার এল। শচীকান্ত খেয়ে নিলেন। তারপর বাজলো এগারোটা।

এগারোটা বাজলো।

আর এগারো রাত্রির ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে উঠলেন শচীকান্ত।

বললেন—আজ হয়ত সরোজ আর আসবে না, তুমি বরং বাড়ি ফিরে যাও—আর একদিন বন্দোবস্ত ক'রো।

তা যে হয় না, আমি যে বাড়িতে চিঠি লিখে রেখে এসেছি কণিকা নিরুপায় হয়ে বললে।

তারপব একটু পবে আবার বললে—তা ছাড়া সরোজ আসবেই —আপনি ববং শুতে যান—ও এলে যাবার আগে আপনাকে খবর পাঠাবো - আপনি আমাব জন্যে ভাববেন না—

শচীকান্ত বললেন—তোমারও তো ঘুম পাচ্ছে—তুমিও ঘুমোলে পারতে ?

কণিকা করুণ হয়ে উঠলো।

—আমি ঘুমিয়ে পড়লে যদি সবোজেব আসা টেব না পাই - যদি ডেকে ডেকে ফিবে যায় যদি ...

শেষ পর্যন্ত শচীকান্ত বারোটার সময় উঠলেন।

হঠাৎ শচীকান্ত বিছানার ওপর উঠে বসলেন। ঘড়ি দেখলেন। কোথা দিয়ে ভোর পাঁচটা বেজে গেছে!

গত রাত্রের কথা মনে পড়তেই বাইরে এলেন। তাঁর নায়িকা এতক্ষণ কী করছে কে জানে! বিনিদ্র রাত্রি কাটিয়েছে নাকি সরোজের আশায় আর সেই সঙ্গে দুর্লভ নায়িকার সন্ধান-কামনায়। সেই শেষ রাত্রে শচীকান্ত বাথরুমে গিয়ে মুখে চোখে জল দিলেন।

সরোজ নিশ্চয়ই আসেনি। হয়ত সরোজ বলে কেউই নেই। তাঁর নায়িকার বিকৃত কল্পনার সন্তান সরোজ। সরোজ তার অতৃপ্ত কামনার ছায়াময় সৃষ্টি। সরোজ হয়ত তার স্বপ্নেরই মানুষ।

লাইব্রেরী ঘরের দরজায় হাত দিতেই বুঝলেন ভেতর থেকে বন্ধ।

ধাক্কা দিলেন জোরে। কেউ সাড়া দিলে না।

আবার জোরে আঘাত করলেন। শেষ রাত্রের নিস্তব্ধতা শুধু একটু বিচলিত হলো মুহূর্ত মাত্র। আবার সব শান্ত।

শচীকান্ত বারান্দার দরজা পেরিয়ে বাইরে রাস্তার ধারে জানালায় এলেন। সেখানেও কেউ সাড়া দিলে না। কী হলো? তবে কি সরোজ এসেছে!

হঠাৎ কী যেন সন্দেহ হলো। পূবদিকের বারান্দায় গিয়ে অতি সন্তর্পণে খড়খড়িটা সামান্য একটু তুলে ভেতরে উঁকি মারলেন......

আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পায়ের তলার মাটি থর্ থর্ করে কেঁপে উঠলো।

শচীকান্ত বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেছেন! কালের যাত্রা হঠাৎ যেন এক অঙ্গুলি সঙ্কেতে নিশ্চল হয়ে গেছে ওখানে। ঘরের ভেতরকার আবহাওয়া অভূতপূর্ব এক ঘটনায় নিথর হয়ে গেছে। বর্তমান, ভূত, ভবিষ্যৎ সমস্ত একাকার। শচীকান্তের দম বন্ধ হয়ে এল।

শচীকান্ত স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখছেন—তাঁর চাদরটা কড়িকাঠেব সঙ্গে বাঁধা আর তার শেষ প্রান্তে কণিকার প্রাণহীন দেহটা ঝুলছে--

অনেকক্ষণ পরে দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকা হলো। দেখা গেল একটা ছোট কাগজে কণিকার হাতের লেখা—

'শ্রদ্ধাস্পদেষু, আশা করি এবার আমার কাহিনীর একটা পরিণতি পেলেন—এখন আর আপনার আপত্তি হবার কথা নয়—'

সাতাশে শ্রাবণ

শেষ পর্যন্ত বৈকুণ্ঠ ঠাকুরের পাত্তা পাওয়া গেল। বৈকুণ্ঠ আর বাড়ির ঠাকুর দুজনে মিলে রাঁধলে কোনও অসুবিধে হবে না। ভাঁড়ার বার করে দেবে সুরুচি, সমস্ত দিকে তদারকও করবে সুরুচি—সুরুচি থাকতে আবার ভাবনা! সমস্ত আয়োজনই সম্পূর্ণ হয়ে গেছে।

নিবারণবাবুই প্রথম দুঃসংবাদটা শোনালেন কোর্ট থেকে এসে।

—কাল শুনলুম 'মিটলেস্-ডে' না কি, মাংসই শুনছি পাওয়া যাবে না কাল- এখন যা ভাল বোঝ কর—

হতাশার ভঙ্গীতে কোটের গলার বোতামটা খুলে ফেললেন নিবারণবাবু।

সুরবালা যেন নিদারুণ দুঃসংবাদ শুনেছেন এমনি সুরে বললেন—তাহলে আর বৈকুণ্ঠ ঠাকুরকেই বা ডাকা কেন! মাছের কালিয়া, মাছের পোলাও ওসব আমাদের ঠাকুরই পারবে—

নিবারণবাবু তখন খালি-গা হয়ে পাখার তলায় আরাম করছেন। বললেন, তাহলে বারণ করে দি বৈকুণ্ঠকে আসতে, বটু যাক তাহলে আজ রাত্রে বারণ করে আসুক—দু'টাকা বায়না নিয়েছিল, সেই টাকা দু'টোই গচ্চা গেল—

সুরবালা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন—ওমনি রাগ হয়ে গেল, রাগের কথা কি বলেছি, মাংস যদি না পাওয়াই যায় তো মাছই চার পাঁচ রকমের করতে হবে—কমলার ছেলেরা মাংস খেতে ভালবাসে তাই মাংস-মাংস করেছিলাম—

সুরুচি ঘরে এল। বললে—বাবা, মিষ্টির দোকান থেকে লোক এসেছে, বলেছি বসতে—

বসুক-বলে নিবারণবাবু উঠলেন। তারপর কলঘরে যেতে যেতে থেমে বললেন-ক্ষীর-কদম্ব বলে একরকম নতুন খাবার উঠেছে শুনছিলুম--কী জানি খেতে কেমন—দেব অর্ডার?—জিজ্ঞেস করলেন সুরবালাকে।

সুরবালা বললেন—তাহলে যে ন'রকম মিষ্টি হ'য়ে যায়, একটা ক্ষীরের ক্ষীরকান্তি তো রয়েছেই, আবার ক্ষীর-কদম্ব—তা হোক—বছরে একটা দিন—

বছরে একটা দিনঃ সাতাশে শ্রাবণ!

এই সাতাশে শ্রাবণই সুরবালার মন্ত্র দীক্ষা নেবার দিন। তিন বছর আগে হিমালয় থেকে গুরুদেব এসে সুরবালাকে দীক্ষা দিয়ে শিষ্যা করে আবার হিমালয়ে চলে গিয়েছিলেন। প্রতিবছর সেই তারিখটি স্মরণ করার উপলক্ষ্য করে তাঁর গুরুদেবকে ভক্তি শ্রদ্ধা দেখানোই সুরবালার উদ্দেশ্য।

গুরুদেবের একটি ছবি টাঙানো আছে লক্ষ্মীর ঘরে। রোজ সেখানে ধূপ ধুনো দিয়ে প্রদীপ জেলে সন্ধ্যাবেলা জপ করেন সুরবালা। প্রতি সন্ধ্যাবেলা আধঘণ্টা সময় ওখানেই কাটে সুরবালার। আর সাতাশে শ্রাবণ উৎসব হয়—গুরুদেবের ভোগ হয়—নিমন্ত্রিত অভ্যাগত আত্মীয়-স্বজনরা প্রসাদ পায়—সেই দিন বিভিন্ন তিনটি দেশ থেকে সুরবালার তিনটি মেয়ে—ছেলেমেয়ে জামাইদের সঙ্গে নিয়ে সুরবালার বাড়িতে আসে। দু'বার ভালো করে উৎসব সম্পন্ন হয়ে গেছে। এবার তৃতীয় বার্ষিকী!

সুরবালার আগেই ঘুম থেকে উঠে সুরুচি কাজে হাত লাগিয়েছে। ঝি চাকর ঠাকুরকে তুলে দিয়েছে। উনুনে আগুন দিইয়েছে। বাবার দাড়ি কামাবার গরম জল—চায়ের জল—মার চোখের ওষুধ—ছোট ঘড়িটাতে দম দেওয়া, স্নান প্রভৃতি সেরে—কাপড় বদলে কালকের উৎসবের আয়োজন করতে লেগে গেছে!

অতগুলো লোক আসবে, থালা গেলাস বাটি গুণে গুণে সিন্ধুক থেকে বার করলে। করে কলতলায় ফেলে দিলে। বললে—এগুলো মেজে ফেলো তো লক্ষ্মীর মা, কাজের ভিড়ে কাল আর হয়ে উঠবে না—

তারপর কত কাজ সুরুচির। তিন দিদির তিনটে ঘর সাজানো কি সোজা কথা! দরজার পর্দা টাঙানো থেকে শুরু করে বালিশ বিছানা মশারী। খাটানো। বড় জামাইবাবু শৌখীন লোক। দেয়ালে দু'চারখানা ছবি টাঙালে। জানলায় সবচেয়ে বাহারি পর্দা ঝুলিয়ে দিলে। দরজার চৌকাঠে একটা ভালো কার্পেট পেতে দিলে। বড়দি সুরুচিকে খুব ভালবাসে। সেবারে যখন এসেছিল তখন তার জন্যে একটা বেনারসী সিল্কের থান এনেছিল।

সুরবালা ঘরে ঢুকে বললেন—হ্যাঁ মা, কত খাটছিস তুই, কিছু মুখে দিসনি তো?

সুরুচি বললে—চা তো খেয়েছি—

—আমি গুরুদেবকে রোজ তোর জন্যে বলি, উনি তো সবই দেখতে পান, দেখবি তোর ভাল করবেন উনি—তাঁকে এই যে সেবা করছিস এতে তিনি তোর মঙ্গল করবেন!

সুরুচি বললে—তাহলে দক্ষিণের দু'টো ঘরই মেজদি আর ছোড়-দিদিদের দিই—

—ওমা তুই তাহলে কোথায় শুবি? উত্তরের ঘরে? ওঘরে পাখা নেই যে মা, গরম হবে না?

—তা হোক, ওরা দু'দিনের জন্যে এসে কেন কষ্ট করতে যাবে......

মেজদির চাদরটা একটু ময়লা হোল, তা হোক গে, কী বল মা—

সুরবালা বলেন—কাল এক স্বপ্ন দেখলুম মা, যেন গুরুদেব এসেছেন, এসে আমার চোখ দুটো চেপে ধরলেন, চেপে ধরতেই—কী বলবো মা, যেন চারদিক আলোয় আলো হয়ে গেল, দেখলুম গুরুদেব নেই, তাঁর বদলে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম নিয়ে স্বয়ং ব্রহ্মা আমার দিকে চেয়ে আছেন, আমি তো মা আনন্দে প্রণাম করতেই ভুলে গেলুম-মূর্চ্ছাই যাচ্ছিলুম—হঠাৎ গুরুদেব চোখ দুটো ছেড়ে দিলেন, দেখি আমার গুরুদেব আবার আমার সামনে বসে বসে হাসছেন। বললেন—চিনলি আমাকে?

সুরুচি বললে—মেজদিদের একটি বালিশ কম পড়েছে কিন্তু, -আমার বালিশটাতেই মেজদি শোবে'খন—আর ঘরে লোক না থাকলে কি ঘরের শ্রী থাকে, কী বলো মা,—কতদিন এ সব ঘরে ঢোকা হয়নি, ভূতের রাজ্যি হয়ে আছে—বলে সুরুচি ঝাঁটা নিয়ে ঝুল ঝাড়তে লাগলো।

কমলার বর লখ্নৌর উকীল। তাদের গাড়ি আসবে সকাল ছ'টায়। বিমলার বর থাকে পাটনায়- সে ডাক্তার, তাদের গাড়ি আসবে ন'টার সময়। তারপর অমলার বর থাকে মালদ'য়—জমিদার তারা--আসবে বেলা এগারোটায়।

সুরবালার সকালের জপ শেষ হয়েছে- এবার জলযোগ করে পাঠ আরম্ভ হবে। মোহন কথক রোজ এসে ভাগবতগীতা পাঠ করে। কোনও কোনও দিন পাড়ার দু'একজন বুড়ি এসে জড়ো হয়। কথা শুনতে শুনতে সুরবালার চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়ে। যতবার এক একটা অধ্যায় শেষ হয়, আর সুরবালা ততবার গলায় আঁচলটা দিয়ে গুরুদেবের ছবির তলায় মাটিতে মাথা ছুঁইয়ে প্রণাম করেন।

সুরুচি ততক্ষণে রান্নাঘরে ঢুকে ঠাকুরকে বকতে শুরু করেছে—কী করবো—

সুরবালা যেন বিরক্ত হন, বলেন---ওসব লক্ষ্মীর-মা যা ভালো বোঝে করবে'খন—তুই একটু আয়না মা, বসে দুটো কথা শোন না, তোর কেবল সংসার আর সংসার—

সুরুচি ততক্ষণে রান্নাঘরে ঢুকে ঠাকুরকে বকতে শুরু করেছে—তোমার আক্কেলখানা কী ঠাকুর, আঁশের উনুনে তুমি নিরামিষ কড়াটা কী বলে চাপালে—তুমি কি আজ নতুন মানুষ এলে এ-বাড়িতে?

তারপর উঠোনের দিকে চেয়ে লক্ষ্মীর মাকে বলে—তুমি বাপু ওই কাচা কাপড়ে নর্দমা পরিষ্কার করছো, আমি কিন্তু ও-কাপড়ে তোমাকে শিল ছুঁতে দেব না—মা'র না হয় এসব দিকে নজর নেই, কিন্তু আমি তো কাণা হইনি—

সমস্ত দিকে নজর না রাখলে কী চলে? বাবাকে খাইয়ে-দাইয়ে কোর্টে পাঠিয়ে সুরুচি বাবার ঘরটাও পরিষ্কার করতে গেল।

বিছানা, টেবিল, আলনা গুছোতে গুছোতে সুরুচি পুরনো চিঠি-পত্রের বাক্সটাও গুছোতে বসলো। অনেকদিনের অনেক বাজে চিঠি জমে অকারণে ভারি হয়ে উঠেছে। হঠাৎ মনে হলো কে যেন ঘরের মধ্যে ঢুকলো—ঢুকে লুকোল কোথাও। পেছন ফিরে দেখে—না, তারই প্রতিবিম্ব পড়েছে আয়নাতে। সুরুচির বহুদিনের আগের কথা একটু মনে পড়াতে ঠোঁটের কোণে একটু হাসির আভাস উঠে আবার মিলিয়ে গেল।

চেয়ারের ওপরে উঠে আলমারির মাথাটা পরিষ্কার করলে। কয়েকটা লাল রঙএর চিঠি বেরুল। সুরুচির বিয়ের চিঠি। কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেললে সেগুলো। যত সব বাজে জঞ্জাল!

তারপর মতিলালকে ডাকলে। বললে বালতি করে জল নিয়ে আয়—আর ঝাঁটা নিয়ে আয়—ঘর ধুতে হবে।

দুজনে মিলে তারপর সমস্ত ধোয়া, মোছা, ঝাড়া, সে এক কাণ্ড।

সুরবালা দেখে বলেন—এ কী কাণ্ড মা তোর, আমি গুরুদেবকে কাল তাই বলছিলাম—আমার রুচির কষ্ট আর আমি দেখতে পারিনে বাবা, গুরুদেব বললেন—ওকেও দেব দীক্ষা, সেবার আমার সঙ্গে একসঙ্গে দীক্ষা নিলে কেমন হোত বল্ দিকিনি—মুখটা একেবারে শুকিয়ে গেছে-আহা মা আমার!

সুরুচি বলে—তুমি সরো দিকি এখান থেকে, আমি এত কষ্ট করে ধুচ্ছি আর তুমি কাদা পা দিয়ে সব নোংরা করে দিচ্ছ?

সমস্ত দিন ধরে আয়োজন করেও মনে হয় কোথায় যেন কি ভুল হয়ে গেল। গুরুদেব ফুল ভালবাসেন—দশ টাকার ফুলের মালার অর্ডার দেওয়া হয়েছে। পাঠককে বলা হয়েছে তিনবার গাড়ি নিয়ে স্টেশনে যেতে হবে—একবার সকাল ছ'টায়, আর একবার ন'টায়, আর শেষবার এগারোটার সময়। প্রথম দু'বার হাওড়ায়-শেষবার শিয়ালদয়।

অনেক রাতে সমস্ত কাজ সেরে বিছানায় শুয়েও শান্তি নেই সুরুচির। কত ভাবনা—ভাঁড়ার ঘরের তালাটা বন্ধ করে একবার টেনে দেখেছে তো? পেছন দিকে বারান্দার আলোটা নিবিয়েছে তো? ছাতের সিঁড়ির দরজা বন্ধ করা হয়েছে তো? তারপর ভোরবেলা মতিলালকে পাঠাতে হবে এক-ঘড়া গঙ্গাজল আনতে—পাঠক হাওড়া স্টেশন থেকে ফেরবার পথে কলাপাতা আর ফুলের মালাগুলো নিয়ে আসবে—সুখলালের দোকানে

মিঠে পানের অর্ডার দেওয়া হয়েছে—সে কি আর সকালবেলা পাওয়া যাবে! কত ভাবনা সুরুচির......

সুরুচির ডাকাডাকিতে সুরবালার ঘুম ভেঙে গেল ভোরবেলা।

আজ সত্যিই অনেক কাজ সুরবালার। এখনি স্নান করতে হবে—করে গরদের শাড়ি পরতে হবে। পরে নিজের হাতে গুরুদেবের জন্যে ভোগ রাঁধতে হবে। নিজের হাতে ভোগ রেঁধে তিনি পুজোর ঘরে ঢুকবেন—ঢুকে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেবেন। সকাল থেকে শুরু করে গুরুদেবকে ভোগ দেওয়া পর্যন্ত কোনও পুরুষের মুখ দেখা নিষিদ্ধ—এমন কি নিবারণবাবুও নাকি সামনে থাকতে পারবেন না।.....

সুরবালার আজ কেবলই ভয়—কখন বুঝি ত্রুটি হয়ে যায়! বর্ষাকাল ঝম্ ঝম্ করে দিনরাতই বৃষ্টি লেগে। তবু মুখে বলছেন—তাঁর কাজ তিনিই দেখছেন, আমি তো উপলক্ষ্য মাত্র—

সুরুচি ঘুরে ঘুরে একবার মাকে সাহায্য করছে, একবার ভাঁড়ার দেখছে আর একবার সমস্ত বাড়িটার কোথায় কী হচ্ছে দেখে বেড়াচ্ছে।

বৈকুণ্ঠ ঠাকুর পাকা লোক। এসেই শুনেছিল মাংস পাওয়া যাবে না। তারপর নিজেই বেরিয়ে কোথা থেকে পাঁচ টাকা সের দরে মাংস নিয়ে এসেছে।

ভাঁড়ার ঘরে এসে বলে—খুকিদিদি, একসের আদা চাই

দুটো বড় বড় মাটির উনুনে রান্না হচ্ছে। বৈকুণ্ঠ ঠাকুর আরো দু'জন সহকারী নিয়ে সেখানে আগুনের তাতে বসে ঘামছে।

পাঠক স্টেশন থেকে খালি গাড়ি নিয়ে ফেরৎ এল। বললে—খুকিদিদি, ৮'টার গাড়িতে বড় দিদিমণিরা আসেনি—

সুরবালা রাঁধছিলেন। শুনে বললেন—তখনই জানি, ওরা আসবে না, কমলাই যদি না আসবে তাহলে কার জন্যেই বা এত আয়োজন,—কার জন্যেই বা কী? ....যাক্, আমি কে—তাঁর কাজ তিনিই দেখবেন—

সুরুচি বলে দিলে—ন'টার গাড়িতে মেজদি'মণিদের আনতে যেও আবার—আর দেখ, আসবার সময় সুখলালের দোকান থেকে মিঠে পান আর বাজার থেকে ফুলের মালা আনতে ভুলোনা।

বড় বড় রুই মাছ এসে উঠোনে পড়েছে। দু'জন জেলে-বৌ বড় বড় বঁটি নিয়ে মাছ কুটছে। সুরুচিকে দেখে একজন বলে—ও খুকিদিদি, এই মাছের দাগাটুকু নিচ্ছি আমার মেয়ের জন্যে—বলে এক টুকরো মাছ হাত বাড়িয়ে দেখালে।

মাংস রান্নার তীব্র গন্ধ এসে সুরুচির নাকে লাগলো। সেই গন্ধে সমস্ত শিরা উপশিরা তার শিথিল হয়ে এল। পেঁয়াজ, রসুন বাটা হচ্ছে

তাল তাল। এক একটা তরকারি রান্না হচ্ছে আর পাত্র করে তুলে এনে রাখছে ভাঁড়ারের ভেতরে। একটা নিরামিষ ভাঁড়ার, একটা আঁশের আর একটা মিষ্টির। মিষ্টির ভাঁড়ারে কলাপাতা, মাটির গেলাস, কুশাসন জড়ো হয়েছে। তিনটে ভাঁড়ারের চাবি নিয়েছে সুরুচি নিজের কোমরে।

—ওমা, সুরুচি, পুজোর ঘরের দরজাটা খুলে দে মা।

একটা ভোগ রান্না হয়েছে। সুরুচি পুজোর ঘরের শেকলটা খুলে দিলে। গঙ্গাজল দিয়ে সমস্ত ঘরটা সুরবালা নিজে হাতে ধুয়েছে। এক একটা ভোগ রান্না হবে আর এই ঘরে এনে তুলতে হবে। ঘবের ভেতর একটা পেতলের প্রদীপে ঘিয়ের বাতি জ্বলছে। ফুলের মালা এলে গুরুদেবের ছবিটা একেবারে ফুলে ফুলে ঢেকে যাবে। ধূপ-ধুনোর গন্ধ ছড়াচ্ছে চারিদিকে। একটা চন্দনকাঠের বাক্সর ভেতবে ভাগবতগীতা সাজানো আছে। কড়িকাঠে একটা ইলেকট্রিক পাখা ঝুলছে। চার দেয়ালে চারটে বড় বড় আয়না, একটা তাকে একটা লক্ষ্মীর সিঁদুর-চুবড়ি। মাথার উপর ধানের শুকনো শিষ ঝুলছে। একপাশে জলচৌকির উপর আলপনা দেওয়া। রুপোব পঞ্চপ্রদীপ, ধূপদানি আর দুটো রুপোর হ্যাণ্ডেল দেওয়া সাদা চামর আর তারই একপাশে পঞ্চমুখী শাঁখ একটা। ফল কেটে নৈবেদ্য সাজিয়ে আগেই রাখা হয়েছে জলচৌকির সামনে—একটা পেতলেব কমণ্ডলুতে গঙ্গাজল।

বৈকুণ্ঠ এসে বলে— ও খুকিদিদি, পোলাও-এর চাল বাব কবে দাও -আর আখুনির জলের মসলা আর নতুন কাপড় এক টুকরো-

লোকজন এখনও এসে জড়ো হয়নি। এরি মধ্যে জলে-কাদায় প্যাচ-প্যাচে হয়ে গেল সারা বাড়ি। লক্ষ্মীর মাকে ডেকে বললে- নতুন ঝিকে দিয়ে একবার মুছিয়ে নাও না লক্ষ্মীর মা, পিছলে পড়ে গিয়ে হাড়গোড ভাঙবে—

তারপর নতুন 'ঠিকে' লোকদের বললে—তোরা এবার চা-জলখাবাব খেয়ে নে—চা চিনি দুধ দিচ্ছি, বৈকুণ্ঠ ঠাকুরের চা তৈরি করে নে—আব এক টুকরো কলাপাতা নিয়ে সব বোস দিকিনি, মিষ্টি দিচ্ছি—

বাইরে মোটরেব শব্দ হোল। মেজ মেয়ে বিমলা, মেজ জামাই, নাতি-নাতনি এসে হাজির।

নিবারণবাবু খবর পেয়ে নিচে এলেন। সুরুচি এগিয়ে গিয়ে জামাই-বাবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। প্রণাম করাকারির পালা শেষ হলে নিবারণবাবু বললেন—চল চল সব ওপরে চল—

বিমলা বললে—কিরে রুচি, তুই এত রোগা হয়ে গেছিস—

সুরুচি বলে—তা বলে তোমার মত মোটা হব নাকি কেবল—

বিমলা বলে—সত্যি ভাই, কী মোটাই হচ্ছি, তোর জামাইবাবু ডাক্তার হলে কী হবে—হ্যাঁরে তোদের এখেনে কী বায়স্কোপ হচ্ছেরে?

—কী জানি বাপু, বায়স্কোপের খবর রাখিনে, তা এসেই একেবারে বায়স্কোপ যাওয়া—এতদিন পরে এলে গল্প-টল্প কর।

বিমলা বলে—না বাপু, গল্প-টল্প পরে অনেক হবে'খন—চান করে ভাত খেয়ে নিয়েই বেরুব—কতদিন বেরুতে পাইনি—

খানিক পরে ট্যাক্সি করে বড় মেয়ে কমলারা এলো।

বলে—ট্রেন ফেল করে এই দুর্গতি—কোথায় রে, বাবা কোথায়, মা কোথায়, ওমা, কী রোগা হচ্ছিস তুই দিন দিন,...বিমলা অমলা ওরা এসেছে?

তারপর বলে—উঃ, ট্রেনে কী ভিড় ভাই, কোমর ফেটে গেছে বসে বসে—আমি বাপু আজ কোনও কাজই করতে পারবো না—আমি কেবল বসে বসে তরকারি কুটবো—

বিমলা খবর পেয়ে এল—ওমা বড়দি এখন এলে? আমরাও এই এলুম, রুচিকে এসেই তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিলুম, কানের এটা কবে করালে দিদি, বেশ হয়েছে, একটা কঙ্কণ গড়তে দিয়েছিলুম, আসবার সময় স্যাকরা বেটা দিতেই পারলে না, ছ'গাছি করে এই বেঁকি গড়িয়েছি এবার—মেড়োর দেশে এই-ই নতুন ডিজাইন—

পাঠক ফুলের মালা আর খিলি পান নিয়ে এসেছে। ফুলগুলো মাকে দিয়ে এল।

সুরুচি দেখলে মার আর কোনও দিকে নজর নেই। ভোগ সব রান্না হয়ে গেছে। পুজোর ঘরে থরে থরে সাজিয়েছে। সুরবালা ফুলের মালা নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন—খুলবেন দুপুর বারোটার পর।

ছোড়দি'রা এসে গেল সাড়ে এগারোটায়। এসেই বললে—হ্যাঁরে, বড়দি মেজদি ওরা এসেছে? বলেই উঠে গেল ওপরে।

দোতালায় দিদিদের ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি চালিয়েছে—দুপদাপ শব্দ সুরুচির কানে এল। সমস্ত ব্যবস্থাই ওদের ঠিক করে রেখেছে সুরুচি,—বাথরুমে তোয়ালে, গামছা, সাবান, তেল, দাঁতমাজা, সব—সব! কতদিন পরে বাপের বাড়িতে এসেছে—ওদের সমস্ত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সুরুচিরই তো দেখা উচিত।

তিন বোনের কত কাপ চা লাগবে হিসেব করে, চা তৈরি করে দিয়ে এল।

কমলা বললে—তোর জন্যে কী এনেছি দেখলি না রুচি?

—আসচি বড়দি—ওদের ঘরে চা দিয়ে আসি—বলে সুরুচি মেজদি'র ঘরে এল। মেজদি'রা স্নান সেরে কাপড় বদ্‌লেছে। মস্ত বড় একটা ট্রাঙ্ক খুলে কাপড়চোপড় জিনিসপত্তর গুছোচ্ছে। সুরুচিকে দেখে

মেজদি বললে—দেখতো রুচি, কোন কাপড়টা পরি—তোরা বাপু শহরে থাকিস্, কোনটা ফ্যাশন কোনটা ফ্যাশন নয় তোরাই ঠিক বলতে পারিস—

মেজদি'রা বায়স্কোপে যাবে তারই আয়োজন হচ্ছে। ট্রাঙ্ক ঝেড়ে একগাদা পোশাকী কাপড় বার করে দিলো মেজদি। বললে—দে ভাই, তুই একটা বেছে দে—

তারপর বললে—আর ভাই, সেবার এসে যতগুলো ব্লাউজ তৈরি করে নিয়ে গেলাম সব ছোট হয়ে গেল—নতুন রয়েছে, কিন্তু একটাও গায়ে হয় না—

—হ্যাঁরে এ শাড়িখানা কেমন বলতো। আশী টাকা দিয়ে কিনেছি এবার—

মেজদি'র শাড়ি, ব্লাউজ, গয়না সব সুবুচিকে দেখতে হলো। তারপর এলো ছোড়দি'র ঘরে।

ছোড়দি বললে—হ্যাঁরে বুচি, গাড়িটা এখন একবার দিতে পারবি ভাই, আমার এক ননদ থাকে শ্যামবাজারে, একবার দেখতে যাবো ভাবছি

তারপর সুরুচির সঙ্গে একান্তে অনেক কথা হোল ছোড়দি'র—আসবার সময় শাশুড়ি বললে—বৌমা যাচ্ছো, আমার তো এই শরীরের অবস্থা, কাজ হয়ে গেলেই চলে আসবে, আমি ভাই বছরের মধ্যে এই একবার যা বেরুতে পাই, তা-ও বেরুতে দেবে না শাশুড়ি মাগী, তুই ভাই বেশ আছিস রুচি,

তারপর আবার বলে— পর পর তিনটি মেয়ে হয়েছে উঠতে বসতে শাশুড়ির কথা শুনতে হয়, বলেন—পাড়ার কত বউই দেখছি তোমার মতন এমন মেয়ে-বিউনী দেখিনি আমার জন্মে, স্বর্গে থেকে এক ফোঁটা জল পাবে না পূর্বপুরুষরা, আমি বেঁচে থাকতে এ-ও দেখতে হবে চোখ মেলে। তুই বেশ আছিস ভাই বুচি, বেশ আছিস—

সুরুচি আবার বড়দি'র ঘরে এলো।

বড়দি বললে—আসবার সময় তোর জন্যে কী নিয়ে আসি ভেবে ভেবে অস্থির আমরা—

সুরুচি বলে—বারে, আমার জন্যে আনতেই হবে তার কী মানে আছে? আমার তো সবই আছে—

—তা সে কত দোকানই ঘুরলাম,কেবল এনামেল করা পানের কৌটো, জর্দার কৌটো, গয়নার বাক্স, নয়ত সিঁদুর কৌটো— আর আছে সব খেলনা, আতরদান, সুর্মাদান, তোর জামাইবাবু আর আমি বাজারে ঘুরে ঘুরে হয়রান--

সুরুচি হাসলে।

—শেষকালে এই গরদের থানটা নিলুম, একটা চাদর হবে, একটা কাপড়

করবি—তোর তো আবার শুদ্ধ অশুদ্ধ বিচার হচ্ছে—কেমন হয়েছে রে, পছন্দ হয়েছে তো?

সুরুচি থানটাকে বুকে তুলে নিয়ে বড়দি'র পায়ের ধুলো নিতে যাচ্ছিল, বড়দি ডান হাতে সুরুচির গলা জড়িয়ে ধরে নিজের কোলে টেনে নিলে—ছি ভাই, পায় হাত দিতে নেই,—তোর কথা সেখানে বসে যে কত ভাবি, তুই তার কী বুঝবি, আমরা চার বোন, চার বোন চারদিকেই তো চলে গিয়েছিলাম, বাবা মা'র কাছে থাকবার কেউ ছিল না, হঠাৎ তুই ফিরে এলি—বাবা মা'কে দেখবার তবু একজন লোক হোল—কিন্তু যেদিন খবরটা শুনলুম—সারাদিন কেবল হা হা করে বুকের মধ্যে হাহাকার উঠেছে—

সুরুচি বললে—আমি উঠি বড়দি—

—কেন, কী এত কাজ, একটু বোস না সকাল থেকে তো আজ কিছুই খাসনি, আজ সারাদিনই তো তোর উপোস—মার উৎসব তা তোর এ উপোস কেন বলতো রুচি?

—আমি উঠি বড়দি—ওদিকে কী যে হচ্ছে কে জানে—ধড়ফড় করে উঠলো সুরুচি।

যা ভেবেছে তাই। কলাপাতাগুলো আধোয়া পড়ে রয়েছে, কাক উড়ে এসে রান্নার জলে মুখ দিয়েছে—বাসন মেজে এনে জলসুদ্ধ বাসন রেখে দিয়েছে ঝি, বলবার কেউ নেই বলে মোছা হয়নি। নিজে না করলে কোনও কাজটা যদি হয়—পরের ওপর আবার ভরসা!

এখনি মা বেরুবে পুজোর ঘর থেকে! দিদিদের ছেলেমেয়েরা খেতে বসবে। বৈকুণ্ঠ ঠাকুর রান্না মোটামুটি সব শেষ করে এনেছে।

বড়দি এল নিচে, বললে কিছু কাজ থাকে তো দে, বসে বসে করি—

সুরুচি বলে- তুমি কেন কাজ করতে যাবে বড়দি, এসেছ একদিনের জন্যে

একদিনের জন্যে এসেছি বলেই তো কাজ করবো, ওরা কোথায় রে—বিমলা, অমলা—

—মেজদি বায়স্কোপে যাচ্ছে আর ছোড়দি যাবে ওর শ্যামবাজারে ননদের বাড়ি—বড়দি তুমি ওঠ, এখানে আমি ছেলেমেয়েদের খাবার জায়গা করি—

—ও খুকি, খুকিরে—ওপর থেকে নিবারণবাবু ডাকলেন সুরুচিকে-

ওপরে গিয়ে সুরুচি দেখে—বাবা একেবারে অসহায়—কলমে কালি ফুরিয়ে গেছে। প্রকাণ্ড একটা ঘরের মধ্যে বই কাগজ খুলে নিবিষ্ট মনে লিখতে লিখতে হঠাৎ কলমের কালি ফুরিয়ে গিয়েছে। সুরুচি না থাকলে নিবারণবাবুর কলমে কালি যে কে ভরে দিত সে একটা ভাববার বিষয়।

—ও রুচি, রুচি—মা ঠাকুর ঘর থেকে বেরিয়েছেন।

—যাই মা—বলে সুরুচি নিচেয় নেমে এল দৌড়ে।

—এই সব প্রসাদ ঘরে তোল মা, বাইরে কোন অসুবিধে হয়নি তো—

—বিমলা. কমলা, অমলা এসে পড়েছে সব? কেমন আছে সব. ভাল? কর্তা ডাকছিলেন কেন—বছরে একটা কাজের দিন, তা-ও একটু ফুরসৎ নেই—কলমে বুঝি কালি ফুরিয়েছিল?

সুরুচি সব প্রসাদ ভাঁড়ারে তুলে চাবি তালা দিয়ে দিলে।

বিমলা এল। বললে—মা, আমরা এসে পড়েছি—নিচু হ'য়ে পায়ের ধুলো নিলে।

মা চিবুকে হাত দিয়ে চুমু খেয়ে বললেন—এই রুচিকে তোমাদের কথাই জিজ্ঞেস করছিলুম—এই দেখ মা গুরুদেবের আশীর্বাদে সব কাজই তো নির্বিঘ্নে হচ্ছে—এখন কী জানি কী তাঁর মনে আছে..সবই তো তাঁর ইচ্ছে—

তারপর আবার বললেন—গুরুদেবকে তাই বলেছিলাম—আমার কোনও সাধই তো অপূর্ণ রাখনি বাবা, একটা শুধু কষ্ট আছে মনে, আমার মা রুচির মনে সুখ দিও, তা জানিস বিমলা, গুরুদেব রাজী হয়েছেন, বলেছেন ওকেও দীক্ষা দিয়ে আসবো, এখন ওর কপাল—

সুরুচি বললে—মা এইবার তুমি জল খেয়ে নাও—

সমস্ত কাজই নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলো। সুরুচির তীক্ষ্নদৃষ্টি প্রত্যেকটি দিকে। কোথাও কোনও বিশৃংখলা হবার উপায় নেই। কিন্তু বিকেল শেষ হবার সংগে সংগে হঠাৎ যেন সমস্ত পণ্ড করে দেবাব জন্য আকাশে মেঘ করে এলো। তারপর ঝড় উঠলো—তারপর এলো বৃষ্টি।

সে এক প্রলয় কাণ্ড! এমন বৃষ্টি বোধ হয় কত বছর হয়নি, আর দিন বুঝে কিনা ঠিক আজই হলো।

সুরবালা বললেন—কী হবে মা রুচি?

আকাশ বাতাস ভেঙে যেন বৃষ্টি নামছে। বৈকুণ্ঠ ঠাকুবেব উনুনের ওপর ত্রিপল ছিঁড়ে হুড় হুড় করে জল পড়তে শুরু হলো। রান্না বন্ধ। বর্ষাকালের উৎসব—যথাবিহিত চারিদিকে ঢাকা হয়েছিলো মজবুত করে। কিন্তু হাওয়ার যা প্রবল ঝাপটা, বৃষ্টির যা ভীষণ বেগ—সমস্ত কোথায় ওলটপালট হয়ে গেল। বৈকুণ্ঠ ঠাকুরের দলবল আটা, ময়দা, ঘি, তেল নিয়ে একেবারে ঘরের মধ্যে এসে আশ্রয় নিল। বৈকুণ্ঠ বলে—কাজের বাড়িতে অনেক বৃষ্টি দেখেছি, খুকিদিদি, কিন্তু এমন বৃষ্টি কখনও দেখিনি—

সামনে রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে গেল।

আটটা বাজলো—এখনি তো সব লোক আসবার সময় হয়েছে—কিন্তু বুঝি সব পণ্ড হল।

সুরবালাই সব চেয়ে চিন্তিত হলেন।—এ কি করলে গুরুদেব, আমি কী অপরাধ করেছি যে এমন করে সমস্ত পণ্ড করে দিলে—

বৃষ্টি যে ছাড়বে কখনও, আকাশ দেখে এমন আভাস পাওয়া গেল না। মেজদি'রা দুপুরবেলাই বায়স্কোপ দেখে এসেছে। ছোড়দি'রা শ্যামবাজার থেকে বৃষ্টির জন্যে আর আসতে পারেনি।

বাড়ির সামনে রাস্তায় এমন জল জমেছে যে গাড়ি চলতে পারছে না।

নিবারণবাবুর কোর্টের কয়েকজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল—তাঁদের জন্যে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন।

বৈকুণ্ঠ ঠাকুর এসে বললে- যে রকম বৃষ্টি, আজ যে ছাড়বে বলে তো মনে হচ্ছে না—রান্নাঘরের মধ্যেই নতুন উনুন পাতি—কী বল খুকিদিদি—

ভাঁড়ার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সুরুচি চুপ করে দেখছিল সব। সকাল থেকে এত পরিশ্রম করে, এত তদারক করে, শেষকালে কি এখন সমস্ত নষ্ট হবে? প্রায় আড়াই শ' লোকের আয়োজন হয়েছে, মা, দিদিরা, বাবা সবাই সুরুচির মুখের দিকে চেয়ে আছে। সমস্ত ভাবনা ও দায়িত্ব তার ওপর দিয়ে যেন নিশ্চিন্ত তারা।

হঠাৎ কিন্তু এক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটলো।

বৃষ্টি থেমে গেল। হঠাৎ এক সময়ে সমস্ত নিস্তব্ধ হয়ে গেল। আকাশে তারা উঠলো যেন সমস্ত এক যাদুকরের ইঙ্গিতে সুপ্রসন্ন হয়ে উঠলো। রাস্তায় জল কমে গেছে। নিবারণবাবুর বন্ধুরা এসে গেলেন। বৈকুণ্ঠ ঠাকুর আবার রান্না চাপালে। একে একে নিমন্ত্রিত অভ্যাগতরা এসে গেলেন।

সুরুচি ভাঁড়ার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে সমস্ত তদারক করে,—কার ড্রাইভারের খাবার দিতে হবে কে শুধু মিষ্টি খাবে কে নিরামিষ—আর ময়দা মাখতে হবে কি না—কত লোকের খাওয়া হলো, এখনও কত লোক বাকি-

—খুকিদিদি ময়দা আরো দু'সের দিতে হবে—আর পাঁপর এক সের—

—ও খুকি দিদি, বাগবাজার থেকে সতীশবাবুর বাড়ির মেয়েরা এসেছে, ওদের গাড়িভাড়াটা—

—বড় মাসিমার ছেলের জন্যে একটা মিষ্টি দাও তো খুকিদিদি, বড় কাঁদছে—

ছোড়দি'র মেয়ের দুধ গরম করা—অনেকদিন পরে ছোট পিসিমা এসেছে একবার ডাকছে সুরুচিকে, তাঁকে প্রণাম করে আসা—

রাত্রি দশটা বাজলো, একটু যেন পাতলা হোল ভিড়। একে একে সব বিদায় নিচ্ছে। সুরুচি এবার সকলকে তাড়া দিতে লাগলো। রাত কি বারোটা করবে নাকি সবাই?

সুরবালা এলেন—দেখলি মা, গুরুদেবের আশীর্বাদে কিছুই তো আটকালো না, সবই তাঁর ইচ্ছে—হ্যাঁ মা, তুই কিছু খাসনি—যা, এবার শুগে যা,—আমরা দেখছি সব—

কিন্তু তবু যাব বললেই যাওয়া হয়না সুরুচির। ঠাকুরদের খাবার দিয়ে ঝি চাকরদের বসিয়ে—বাড়ির সকলের খাওয়া দাওয়া শেষ করে সুরুচি উঠলো। এবার এই প্রথম সে নিজের ঘরে ঢুকবে। কত তার কাজ এখন। সুরুচির সমস্ত শরীরটা ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগলো। ঘরে ঢুকে সুরুচি দরজায় খিল দিয়ে দিলে।

অনেক রাত্রে বিছানায় শুয়ে আবার উঠে পড়লেন সুরবালা। চোখে ওষুধ দেওয়া হয়নি।

সুরবালার চোখের ওষুধ থাকে আলমারির ড্রয়ারে– তার চাবি থাকে সুরুচির আঁচলে। সারাদিনের পরিশ্রমের পর উঠতে আর ইচ্ছে করেনা— তবু উঠতে হোল সুববালাকে। উঠে আলো জ্বাললেন না—নিবারণবাবুর ঘুম ভেঙে যেতে পারে। বারান্দায় এসে প্রথমে পড়ে কমলার ঘব। আলো নিবে গিয়েছে সে ঘরে। তারপর মেজ মেয়ে বিমলার ঘব। ওদের ঘবেও আলো নিবেছে–কিন্তু তখনও মেজ মেয়ের গলা শোনা যাচ্ছে—ওরা জেগে আছে এখনও। তারপর সেজ মেয়ে অমলাব ঘব। সে ঘরে আলো জ্বলছে এখনও ..কথাবার্তাও শোনা যাচ্ছে। তিন মেয়ের ঘর পেরিয়ে তিনি এলেন উত্তর দিকের ছোট মেয়ে সুবুচির ঘরে। সুরুচির ঘরের দরজা বন্ধ। আস্তে আস্তে দরজা ঠেললেন সুরবালা। সাড়া পেলেন না—হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে।

পশ্চিমের বারান্দা দিয়ে সুরবালা জানালার কাছে এলেন। জানালা ঠেলতেই খুলে গেল।

সুরবালা দেখলেন আলো জ্বলছে। তারপর ভেতরে চেয়ে যা দেখলেন তাতে সুরবালা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন।

সুরুচি পরেছে বেনারসী শাড়ি। সারা গায়ে পরেছে গয়না, মাথায় সিঁথি, হাতে চুড়ি কঙ্কণ, কানে দুল আর সিঁথিতে দিয়েছে আগুনের মত উজ্জ্বল সিঁদুর। বিয়ের সময়কার সমস্ত অঙ্গাবরণ তার গায়ে। সুরুচি যেন নববধূ সেজেছে—নতুন করে তার বিয়ে আজ!

সুরবালা নির্বাক বিস্ময়ে দেখতে লাগলেন—

সুরুচি, তার মেয়ে—তাকে যেন এতদিন চিনতেই পারেন নি সুরবালা—আজ নতুন দৃষ্টি নিয়ে দেখছেন নতুন এক সুরুচিকে। সুরুচি যেন আজ তার নতুন করে দৃষ্টি ফুটিয়ে দিয়েছে।

স্বামীর ছবিটা সুরুচি নিয়েছে বুকে—বুকে নিয়ে সুরুচি তার বিছানায় শুয়ে আছে। সুরবালার দু'চোখ জ্বালা করতে লাগলো। তারই পেটের মেয়ে সুরুচি সমস্ত দিনের বেলার সুরুচির সঙ্গে এ সুরুচির কত প্রভেদ!

ছবিটাকে বুকে রাখলে সুরুচি, মুখের ওপর রাখলে, তারপর বিছানা ছেড়ে উঠলো। একে একে সমস্ত গয়না খুললে—কানের দুল, হাতের চুড়ি সমস্ত—বেনারসী বদলে পরলে শাদা থান একটা, সিঁথির সিঁদুর ঘষে ঘষে মুছে ফেললে।

সুরবালা দেখলেন সুরুচি সেই নিরাভরণ শরীরে স্বামীর ছবিটি সাজিয়ে রাখলে মেঝের এককোণে একটা জলচৌকির ওপর। সেখানে আলপনা দিয়েছে বিচিত্র করে ফুল দিয়ে সাজিয়েছে ধূপ জ্বাললে, প্রদীপ জ্বাললে সুরুচি উঠে বসে একদৃষ্টে চেয়ে রইল সেইদিকে। গভীর ধ্যানমৌন মূর্তি তার—সে যেন এ জগতের সমস্ত মায়া সমস্ত আকর্ষণ থেকে দূরে গিয়ে স্বামীর সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছে।

তারপর হঠাৎ একসময়ে যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে মেঝের ওপর উপুড় হয়ে পড়লো। সুরবালার মনে হোল যেন সুরুচি মূর্চ্ছা গেছে—আর উঠবে না

জোরে জোরে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলেন সুরবালা—ও রুচি, মা আমার।

দরজা খুলল।

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সুরবালা আর সুরুচি—আর মাঝখানে একটি দোদুল্যমান মুহূর্ত। একটি মুহূর্তের ব্যবধান—! মার মুখের দিকে চেয়ে সুরুচি হঠাৎ একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে সুরবালার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো—সুরবালা দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন তাকে।

—মা আমার, সোনা আমার—সুরবালার মুখ দিয়ে সান্ত্বনার ভাষা আর বেরুল না—সুরবালার চোখ দু'টো শুধু জ্বালা করতে লাগলো।

সুরবালার মনে ছিল না—সুরুচির হাতের নোয়া আর সিঁথির সিঁদুর ঘুচেছিল সাতাশে শ্রাবণ। তার গুরুদেবের উৎসব আর সুরুচির সর্বনাশ—সে বুঝি একই তারিখে—সে-কথা সুরবালার কেমন করে মনে থাকবে।

আশুকাকা

আশুকাকা তিনদিন আমার খোঁজে আমার বাড়িতে এসেছিল—এবং তিনদিনই আমাকে না পেয়ে ফিরে গেছে।

কথাটা শুনেছি বাড়ির লোকদের কাছ থেকে, কিন্তু বিশেষ কৌতূহলও প্রকাশ করিনি। আশুকাকাকে যারা জানে তারা বলতে পারে যে, আশু-কাকার এই দেখা করতে আসা আমার কোনও উপকারের উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। তবু এমন একটা চরিত্র আমাদের আশুকাকা, যার সান্নিধ্য বিশেষ পীড়াদায়কও নয়। আশুকাকার দাবী বড় সামান্য। একটু খাতির, একটু মাতব্বরি করতে দেওয়া যা বড় জোর টাকাটা সিকেটা।

আমাদের দেশে—এমন জানাশোনা বলতে কেউ নেই। আশুকাকাও আর সকলের মত একদিন চলে এসেছে সপরিবারে। খবর পেয়েছি অন্য সূত্র থেকে -কোন্ এক বস্তিতে আছে আশুকাকা সস্ত্রীক। সারাজীবন কোনও চাকরি বা কোনও অর্থোপার্জন করেনি আশুকাকা। দরকার হলে তিন ক্রোশ দূরের কাছারিতে গিয়ে সাক্ষ্য দিয়ে এসেছে, বিয়ে বাড়িতে কোমর বেঁধে পাঁচশো লোক খাওয়ানোর ভার নিয়েছে, বারোয়ারিতলায় বসে সারারাত যাত্রার আসরে কলকে পুড়িয়েছে। অর্থাৎ আশুকাকা এমন একজন লোক যে সশব্দে বেঁচে থাকে—চারদিকে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করে মাথা উঁচু করে ঘুরে বেড়ায়।

অথচ, সেই সদম্ভ আত্মঘোষণা করবার অধিকার যেন আছে আশুকাকার। যতদিন গ্রামে ছিল আশুকাকা, যখনি ছুটিতে দেশে গেছি, দেখেছি একটা না একটা কাজ নিয়ে ব্যস্ত। শুধু ব্যস্ত নয় ব্যতিব্যস্ত। হন হন করে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে আশুকাকা।

বলি– আশুকাকা, কোথায় চলেছ ?

–কে ? নবনী ? যাচ্ছি একবার ছিন্নাথপুর, ওখেনে মল্লিকদের পুকুরের তলায় নাকি গাজনের শিব উঠেছে—যাই দেরি হয়ে গেল—বলে হন হন করে হাওয়ায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

আর একদিন ওমনি।

–কোথায় চলেছ আশকাকা ?

ভোর তখন ছ'টা। হাঁটা দেখে মনে হবে বুঝি পাঁচ ক্রোশ দূরে মাজ্‌দে ইস্টিশনে ট্রেন ধরতে চলেছে কাকা। কিন্তু তা নয়।

—কে ? নবনী ? যাবে আমার সঙ্গে ? এবার বর্ষায় গাজনার বিলে নাকি জল একেবারে থৈ থৈ করে উপছে উঠছে—চল না দেখে আসি—

তারপর বারোয়ারিতলায় যাত্রার বায়না ক'রে আসা, অটল চক্রবর্তীর বেয়াই বাড়িতে গিয়ে জামাই-এর খোঁজখবর নিয়ে আসা, গঞ্জ থেকে হরি-সভায় খোল কিনে আনা ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কাজের মানুষ আশুকাকা।

সেই আশুকাকা একদিন গাঁ ছেড়ে কলকাতায় চলে এসেছে। দরিদ্র সংসারের মালপত্র যা কিছু এনেছে তার সঙ্গে এনেছে ছিপের বান্ডিল, হুঁকো-কলকে আর কাকিমাকে।

শান্ত-শিষ্ট মানুষটি এই কাকিমা।

মার কাছে গল্প শুনেছি, কতদিন খেতে বসে আশুকাকা দুটি-দুটি করে হাঁড়ির সব ভাত চেয়ে নিয়ে খেয়ে ফেলেছে।

—মাছের টকটা ভারি চমৎকার রেঁধেছ বড়বৌ—আর দুটি ভাত দাও তো—

সতী সাধ্বী কাকিমা নিজের ভাগের ভাত কটিও স্বামীর পাতে ভক্তি সহকারে তুলে দিয়েছে। তারপর কে আবার নিজের জন্যে রাঁধে। এমনি করে কাকিমার কতদিন উপোস করে কেটেছে আশুকাকা তার খবর রাখেনি।

আজো মনে আছে আশুকাকা সকালবেলা গাড়ু নিয়ে মাঠে যেত। ফেরবার সময় কোঁচড়ে কিছু কাঁচা লঙ্কা, পটল, গাড়ুর মুখে একটা পাকা আম বসানো। আর ডান কাঁধের ওপর একটা বিরাট মানকচু কিম্বা মোচা। সকালবেলাই সারাদিনের খাওয়ার জোগাড়টা হয়ে থাকতো। দুপুরবেলা বারোয়ারিতলায় বটগাছের ছায়ায় বাঁশের মাচার ওপর ভিজে গামছা কাছে নিয়ে দিবা নিদ্রা। জীবনের পঞ্চান্নটা বছর এমনি করে নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায় কাটিয়ে দিয়ে আশুকাকা অবস্থা চক্রে পড়ে গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় চলে এল একদিন।

রাস্তায় একদিন কার মুখে যেন শুনেছিলাম আশুকাকারা এসে কলকাতার বরানগরে না টালিগঞ্জে কোথায় উঠেছে। সেও অনেক দিন হলো। তারপর কতদিন কেটে গেল। এতদিন পরে আবার আশুকাকার সংবাদ পেলাম।

পেলাম নয়, সশরীরে আমার বাড়িতেই এসে গেছেন শুনলাম।

সেদিন আমার অফিসেই—

আমার অফিসের ঠিকানা আশুকাকার জানার কথা নয়। কিন্তু ঠিকানা জোগাড় করে দেখা করতে আসা এ-শুধু আশুকাকার পক্ষেই সম্ভব।

চেয়ারটা নির্দেশ করে বললাম—বোস আশুকাকা—

বসবার আগে অফিসের চারদিকে একবার ভাল করে চেয়ে দেখে নিলে। মাথার ওপর পাখা, দেয়ালের গায়ে ঘড়িটা, টেবিলের ওপর পেতলের 'কলিং বেল', ইস্পাতের আলমারি ইত্যাদি ইত্যাদি—

আশুকাকা চেয়ারে বসে অন্যদিকে দেখতে দেখতে বললে—বেশ জায়গায় অফিস তোমার নবনী, বেশ অফিস—সাজানো, গোছানো—কিন্তু আসতে যেতে পেরান বেরিয়ে যায়, এক পিঠের বাসভাড়াই চৌদ্দ পয়সা নিয়ে ছাড়লে—

হঠাৎ যেন কাজের কথা মনে পড়ে গেল। বললে—ভাল কথা, তিন টাকা সাড়ে বারো আনা দাও দিকিনি—তোমার জন্যে এই চার দিনে তিন টাকা সাড়ে বারো আনা পয়সা খরচ করে ফেলেছি—বাসে, ট্রামে, রিক্সায় মোট তোমার গিয়ে তিন টাকা সাড়ে বারো আনাই দিতে হচ্ছে—

কাছারিতে সাক্ষী দিতে গিয়ে যেমন জলখাবার, রাহাখরচ নেওয়া স্বভাব আশুকাকার, এও তেমনি। এ আমার জানা ঘটনা। এসব ক্ষেত্রে নির্বিবাদে টাকাটা বার করে দেওয়াই নিয়ম। আর আশুকাকা চারখানা এক টাকার নোট কোঁচার খুঁটে বেঁধে কোমরে গুঁজে রাখবে—এটাও তেমনি পরিচিত দৃশ্য। এ-নিয়ে আমার প্রশ্ন বা বিস্ময়-প্রকাশ করার কথা নয়।

শুধু জিজ্ঞেস করলাম—বাড়ির সব খবর কী কাকা ?

—বাড়ির খবর পরে শুনো, আর তাছাড়া তা শুনেই বা কী করবে ! সে থাকগে, যে কাজের জন্যে আমি এসেছি—

এই কথাটিই আশুকাকার আসল কথা। আশুকাকাব পথ বড় সোজা। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথা বলতে জানে না আশুকাকা। সরল কথাব মানুষ। মনের আর মুখের কথার মধ্যে কোনও তফাৎ নেই আশুকাকার।

বললে—অটলদার বাড়িতে তোমার নেমন্তন্ন হয়েছে ?

বললাম- হ্যাঁ কাকা, হয়েছে তো—

ম্রিয়মান নয়, অভিমান নয়, লজ্জা দুঃখ কিছু নয়। আশুকাকা যেন পরের শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে ডাক্তারেব সঙ্গে কথা কইছে।

বললে—তোমারও হয়েছে ?

বললাম—কেন, তোমার নেমন্তন্ন হয়নি কাকা ?

স্বগতোক্তির সুরে আশুকাকা বলে যেতে লাগলো—ব্যাপারটা কী রকম হলো বলো তো—শ্যামবাজারের পেরবোধদার বাড়ি গিয়ে শুনলাম ওদের নেমন্তন্ন হয়েছে, টালিগঞ্জের অশ্বিনীদার বাড়ি গিয়ে শুনলাম ওদের নেমন্তন্ন হয়েছে, বালীগঞ্জের সিধুদাব বাড়ি গিয়ে শুনলাম ওদেরও হয়েছে—

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

আশুকাকা বললে—অথচ বলতে পারবে না যে আমার ঠিকানা জানে না—সিধুদার ছেলেকে দিয়ে আমার বাসার ঠিকানাটাও ওদের কাছে পাঠিয়েছিলাম—

তা হলে? মহাসমস্যার কথা আশুকাকা তুলেছে!

ভেবে দেখলাম—আচ্ছা এমন তো হতে পারে যে, ওরা নেমন্তন্নর চিঠি পাঠিয়েছে, কিন্তু পোস্টাপিসের গোলমালে—

—সে-কথা বললে হবে না, নিজে রোজ পোস্টাপিসে গিয়ে খোঁজ নিচ্ছি—আজও গিয়েছিলাম—

আরও ভাবিয়ে তুললে আশুকাকা।

বললে—এই নিয়ে সব সুদ্ধ চারদিন হোল—তিন দিন গেছি তোমার বাড়িতে, শেষে তোমার অফিসে এসে হাজির হলাম—খবরটা শুনে পর্যন্ত রাত্তিরে নবনী, আমার ভাল ঘুম হয় না—

এই ব্যাপারে আশুকাকার মত লোকের ঘুম না-হওয়ারই কথা।

আশুকাকা আবার বলতে লাগলেন—অথচ ভাবো একবার, অটলদা তখন বেঁচে। বড় মেয়ের বিয়ের সময় কলাপাতা থেকে শুরু করে পান পর্যন্ত এই আশু ঘোষ একলা সব জোগাড় করেছিল—

তারপর খানিক থেমে আবার বললে—তারপর বড় ছেলের বিয়েতে যখন শেষ পর্যন্ত ছানা এসে পেঁছিল না সন্ধ্যেবেলা—মনে আছে অটলদা মুখ কালি করে আমার হাত দুটো জাপটে ধরলে, বললে—কী হবে আশু—

সে-সব দিনের সুখ-স্মৃতি বোধ হয় আশুকাকাকে বিচলিত করে তোলবার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু এত সহজে মুষড়ে পড়বার লোকও আশুকাকা নয়।

বললে—যাকগে নবনী—সেই খবরটা নিতেই এতদূরে তোমার কাছে আসা। পরশু বিয়ে, অথচ আজ সকাল পর্যন্ত কোনও খবরাখবর না পেয়ে—যাকগে—

যেন হতাশায় বিরক্তিতে ও-প্রসঙ্গ আর আলোচনা করবে না এমনিভাবে মুখের কথাটাকে অসম্পূর্ণ রেখে থেমে গেল আশুকাকা।

বললাম—তোমার খাওয়া হয়েছে নাকি—বেলা তো দুটো বাজতে চললো—

আশুকাকা সেই ভোরবেলা বেরিয়েছে অনেক তালে। সুতরাং খাওয়া আর কেমন করে হবে। এখানে এই শহরের ব্যস্ত আবহাওয়াতে এসেও আশুকাকার ব্যতিব্যস্ত ভাবটা কাটেনি।

হোটেলে যেতে যেতে বললাম—কাকিমা, কেমন আছে কাকা?

—তোমার কাকিমার কথা বোল না নবনী, তিনি তো মারা গেছেন—

আমি যেন চমকে উঠলাম। নিঃসন্তান আশুকাকা বিপত্নীক হলো কবে? কিন্তু এমন নিঃসঙ্কোচে স্ত্রীর মৃত্যু-সংবাদটাই বা কে দিতে পারে এক আশুকাকা ছাড়া।

জিজ্ঞেস করলাম—কী হয়েছিল শেষকালে?

—হবে আবার কি, একরকম না খেতে পেয়েই মারা গেল বলতে পারো—তা সে কথা থাক—অটলদা'র বাড়িতে এদানি গিছলে নাকি নবনী?

—এই তো কালই গেছি।—বললাম আমি—আমার বিয়েতে ওরাই সব করেছিল, এখন আমি না গেলে খারাপ দেখায়, তাই যাওয়া—ক'দিন ধরে প্রায়ই যাচ্ছি—যাবতীয় কেনা-কাটা—

আশুকাকা কথাটা লুফে নিলে। বললে—খাওয়া-দাওয়ার কী রকম বন্দোবস্ত হচ্ছে দেখলে?

যা-যা হচ্ছিল বললাম।

শুনে আশুকাকা ভীষণ দমে গেল। বললে—সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে, অটলদা নেই, আমাকেও নেমন্তন্ন করলে না—কী যে হবে—

আশুকাকা মাথায় হাত দিয়ে বসবার জোগাড়। বললে—কিন্তু মাছের কী হচ্ছে?

—মাছ তো আমার সামনেই অর্ডার দিলে

—ক'রকম মাছ?

বললাম—এক রকম মাছের কথাই তো শুনলাম—আমার সামনে দেড় মণ মাছেরই তো অর্ডার দেওয়া হলো—

আশুকাকা বলে উঠলো—সব পণ্ড হবে নবনী, এই তোমায় বলে রাখছি দেখো—অটলদা বেঁচে নেই, আমি নেই—কী যে করবে ছেলে ছোকরারা—বদনাম হয়ে যাবে মাঝখান থেকে, দেখে নিও—

বললাম—আর দইঅলা এসেছিল, তাকেও বুঝি দই-এর অর্ডার দেওয়া হলো।

কী দই?

তা জানিনে কাকা—

আশুকাকার জন্যে ভালো করে মাংসের অর্ডার দিয়েছিলাম আর পরোটা। ভেতর থেকে গন্ধ আসছিল। একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল আশুকাকা। একজন ওয়েটার এসে যথারীতি ময়লা ন্যাতা দিয়ে টেবিলটা পরিষ্কার করে গেছে। মনে হোল আশুকাকার যেন লোভ সামলানো দায় হয়ে উঠেছে। হঠাৎ নিজের ধুতির কোঁচাটা দিয়ে পরিপাটি করে টেবিলটা সাফ করতে লাগলো আশুকাকা। বললে—বড্ড ময়লা টেবিলটায়—

মাংস এল। পরোটা এল।

আশুকাকা বললে—খাঁটি পাঁঠার মাংস তো নবনী? দেখো, আমরা সেকেলে লোক—

অভয় দিতেই আশুকাকার মুখ ভর্তি হয়ে উঠলো মাংসে।

তারপর আস্তে আস্তে লক্ষ্য করতে লাগলাম। আশুকাকার ক্ষিদেও খাঁটি, আশুকাকার খাওয়ার রীতিটাও খাঁটি—কারণ আশুকাকা মানুষটাই যে খাঁটি। প্রত্যেকটি গ্রাসের সে কী ভঙ্গী, প্রত্যেকটি খাদ্যবস্তু নিয়ে সে কী কসরৎ। নিঃশ্বাসে, প্রশ্বাসে, ঝোলে, ঝালে—আঙুলে, প্লেটে, মুখে, ঠোঁটে, সবার ওপর চোখের দৃষ্টিতে সে কী সামঞ্জস্যময় মুভমেণ্ট।

আমি দেখতে লাগলাম—

হঠাৎ একটা মাংসের হাড় জিভ আর দাঁত দিয়ে কায়দা করতে করতে আশুকাকা সখেদে বললে—তোমার কাকিমা না খেতে পেয়ে মরেছে, এ-কথাটা আমি ভুলতে পারিনে নবনী—

অনেকক্ষণ ধরে খেয়ে খেয়ে এক সময়ে খাওয়া শেষ হলো আশুকাকার।

হাত ধুয়ে এসে বসল আবার। বললে বেশ খাওয়াটা হলো আজ অনেক দিন পরে মাংস খেলাম সত্যি সেই আড়াই বছর আগে বারোয়ারি-তলায় দুর্গো পুজোর সময় মহাষ্টমীর দিন

পরিতৃপ্তির একটা সশব্দ উদ্গার তুললো আশুকাকা। কিন্তু মনে মনে বুঝলাম আশুকাকার সমস্যার কোনও আশু সমাধান যেন হলো না।

আশুকাকা বিদায় নেবার পরেও অনেকক্ষণ ধরে ভাবলাম। আমিই গিয়ে প্রস্তাব করবো নাকি। বাড়িতে কত আত্মীয় অনাত্মীয়, অনাহূত রবাহূত আসবে তাদের সঙ্গে আশুকাকার নামটা জুড়ে দিতে যদি আপত্তি থাকে, নামমাত্র একটা নেমন্তন্ন চিঠি - তাতেও কি আটকাবে? নিমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত অভ্যাগতদের মধ্যে বিশিষ্ট একজন হতে চায় আশুকাকা। তার সেই বাসনা কি অযৌক্তিক। কিম্বা একান্তই হাস্যকর? অপরের শুধু বিপদে নয় উৎসবেও যে তার একটা অধিকার আছে। আজ অটলদা নেই বলেই কি আশুকাকার সমস্ত অধিকার লুপ্ত হবে? নাকি আশুকাকা আজ ঠিকানাহীন বলেই এই অবজ্ঞা।

কিন্তু আমার অবাক হতে তখনও অনেক বাকি ছিল বুঝি।

বিয়ের দিন নয়, বৌভাতের দিনের ঘটনা। একটু সকাল সকালই গিয়েছিলাম। নেহাৎ তো নিমন্ত্রণ রক্ষে করা নয়। সন্ধ্যে হবার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে পৌঁচেছি।

গিয়ে পৌঁছুতেই প্রথমে আশুকাকা ছাড়া আর কার সঙ্গে দেখা হবে?

ফর্সা একটা পাঞ্জাবী পরে খালি পায়ে এগিয়ে এল আশুকাকা। এসেই

ধমকের সুরে বললে—এই গিয়ে এখন তোমার আসা হোল নবনী—তোমরা বাড়ির লোক হয়ে যদি আসতে এত দেরি কর—

—দাঁড়াও আসছি—বলে আশুকাকা বাড়ির ভেতরে সোজা চলে গেল। এবং তার একটু পরেই ফিরে এল আবার।

বললে—রান্নাটা নিজে তদারক করছি কি না—পোলাওটা নাবলো—একটু চেখে এলাম—আজ রান্নাটা খেয়ে দেখো যদি ফার্স্ট কেলাস না হয় তো আমি কান মলতে মলতে না খেয়ে চলে যাবো এ-বাড়ি থেকে—

আরো কয়েকখানা গাড়ি এসে পড়লো। আশুকাকা দৌড়ে গেল ওদিকে অভ্যর্থনা করতে।

বড় ছেলে ছবি। ছোট ছেলে রবি। রবির বিয়ে। কর্তা ব্যক্তির মধ্যে ছবিই একলা। অভ্যর্থনা আয়োজন চূড়ান্ত হয়েছে। আলো, লোকজন, গাড়ি, ফুলের মালা--কোনও ত্রুটি নেই। চাকর-বাকর, কর্মচারী, দারোয়ান, লোক-লস্কর কিছুরই শেষ নেই। কিন্তু সকলের ওপরে আছে আশুকাকা।. আশুকাকার নজর সব দিকে।

আশুকাকা একবার দৌড়ে ভেতরে যায়, আবার বাইরে আসে।

—ওরে রসোময়, মাটির গেলাসগুলো ধুয়ে সাজিয়ে রাখ বাবা—

--হ্যাঁরে, নেবুগুলো কাটবো কি আমি ?

—ঠাকুর, লুচির কড়া চড়িয়ে দাও—সাতটা বেজে গেছে—

—এই যে আসুন, আসুন—বড় আনন্দ হোল, অটল দাদা আজ নেই--তিনি থাকলে দেখে যেতে পারতেন তাঁর ছেলের বিয়েতে কোনও ত্রুটি আমরা হতে দিইনি--

সমাগত অভ্যাগতদের মধ্যে বসে বসে ভাবছিলাম কেমন করে কী হলো। কোনও খুঁতই নেই কোথাও। আশুকাকাও তো ঠিক শেষ পর্যন্ত এসে পড়েছেন। তবে কি তাকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল নাকি! আশুকাকার আচরণ দেখে তো মনে হচ্ছে এখানে তার বহুদিনের যাতায়াত। অন্দরমহলেও অবাধ গতি। কিন্তু তিন দিন আগেও তো টের পাইনি।

আশুকাকা হঠাৎ ইঙ্গিতে আমাকে আড়ালে ডাকলে। কোমরে একটা তোয়ালে জড়িয়েছে। হাতে চায়ের কাপ। এরই মধ্যে তিন চার কাপ খেয়ে শেষ করতে দেখলাম।

কানের কাছে মুখ এনে আশুকাকা বললে—তুমি বলেছিলে শুধু রুই মাছের কালিয়ার কথা, ভেটকি মাছের ফ্রাইটাও করিয়েছি—কারিগর ভালো, খেয়ে দেখো মন্দ করেনি- এই লুচির কড়াটা নামলেই পাতা সাজিয়ে দেবো।

—আর একটা কথা—

চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে বললে—মাংস হবার কথা ছিল না,

আমিই ছবিকে বলে করালাম। বললাম—কতই বা খরচ, তোমার মাংসটা করা চাই. অটলদা খেতে ভালবাসতেন—

আবার চায়ে চুমুক দিলে।

একটু থেমে বললে—নতুন বিলিতি বেগুনের একটা চাটনিও করিয়েছি দেখো—একটু ঝাল-ঝাল—কিছু ভাবনা নেই, আমি তোমার পাশেই বসবো'খন--কোন্‌টার পর কী কতটা খেতে হবে--সব বলে দেব'খন—কিচ্ছু ভাবনা নেই তোমার নবনী—

আশুকাকা যেন আমার পরম উপকার করছে, এমনি একটা বিশ্বাস আশুকাকার বক্তব্যের পেছনে। আশুকাকা অন্তরে অন্তরে বিশ্বাস করে নেমন্তন্ন বাড়িতে কাউকে অগ্রিম খাওয়ার তালিকা জানিয়ে দেওয়া একটা পরম উপকারের সামিল।

কিন্তু যে-প্রশ্নটা আমার মনের মধ্যে খচ্‌ খচ্‌ করে বিঁধছে সেটা আর উত্থাপন করবার ফুরসৎ পেলাম না।

হঠাৎ আশুকাকা বৈঠকখানায় ঢুকলো দুহাত জোড় করে।

- তা'হলে এবার উঠতে আজ্ঞে হোক—

—ঠাকুরমশাই উঠুন—বিধুদা ওঠো ওঠো—ও হরিদাস গা তোল ভাই—অশ্বিনীদা বসে রইলে যে; ওঠ, তোমাকে তো সেই আবার টালিগঞ্জে যেতে হবে -

-ওই যে, সামনের বারান্দায় ঢুকেই ডানদিকে ওপরে ওঠবার সিঁড়ি—বরাবর উঠে পড়ুন—ও অসোময়, মাটির খুরি গেলাসগুলো ওপরে নিয়ে এসো - আর ঠাকুরকে বলো ভাঁড়ার থেকে আরো সের পাঁচেক ময়দা নিয়ে যাক - আমি ভাঁড়ারে বলে দিয়েছি—

- ও তোমার নাম কি ভাই—বেশ বেশ—যেমনি বসবে সবাই, একজন গরম লুচির ঝুড়ি নিয়ে এদিক থেকে ঘুরে যাবে, আর ওদিক থেকে আর একজন পেতলের বালতি নিয়ে নিরামিষ ঘি-ভাত দিতে থাকবে- -তারপর—

তেতলার ছাদে সবাই বসে গেছি। আশুকাকা নিজে এসে বসিয়ে দিয়ে গেছে তার নির্দিষ্ট আসনে। আমার পাশের কুশাসনে নিজের তোয়ালেটা রেখে দিয়েছে। অর্থাৎ আশুকাকার জন্যে আসন সংরক্ষিত হইল।

সবাই বসে গেছে। ডাইনে বাঁয়ে দুই সারি নিমন্ত্রিতের মধ্যে আশুকাকা একলা তদারক করতে বেরিয়েছে। প্রধান সেনাপতির সৈন্যদের কুচকাওয়াজ পরিদর্শনের মত।

—ও অসোময়, হাঁ করে কি দেখছ ওখানে দাঁড়িয়ে—কারুর গেলাসে যে জল নেই দেখতে পাচ্ছ না—

—ওহে তোমার নাম কি—শোন ইদিকে—এর পরে মাংসের পোলাওটা নিয়ে আসবে তুমি, আর বসন্তকে বলবে তার আগে নিরিমিষ মুগের ডালটা গামলায় যেন ঠিক করে রেডি রাখে—তারপরে ছোলার ডালের মুড়িঘণ্ট—

—সিধুদা তুমি মোটে কিছু খাচ্ছো না—গরম দু'খানা লুচি দিক—তুমি তো বরাবর মাংসের পোলাওটা খেতে ভালবাসতে— ফেলে রাখলে যে—

—ও হরিদাস খাও খাও—তোমাদেরই তো খাবার বয়েস—তোমাদের বয়সে আমরা এক একটা আস্ত পাঁঠা একলা খেয়ে হজম করেছি—

—অশ্বিনীদা'কে ভাল করে পরিবেশন করা হচ্ছে না, এ কী খাওয়া হচ্ছে—যেদিকে দেখবো না, সেইদিকেই বে-বন্দোবস্তো—

—ওহে এবার মাছ নিয়ে এস—কালিয়াটা—ফ্রাইটা কেমন হয়েছে ঠাকুর মশাই—নিজে তদারক করে করিয়েছি—আমার হাতের কারিগর পেলে অবিশ্যি আরো ভালো হোত—

এবার আশুকাকা সোজা এসে তোয়ালে তুলে কুশাসনে বসে পড়লো। বললে—পরের ব্যাচে বসলেও চলতো, কিন্তু থাকি অনেক দূরে—

বলে ভাজা দিয়ে লুচি মুখে পুরে দিয়ে বললে—কী করছ নবনী, শাক ভাজা কুমড়োর ঘ্যাঁট দিয়েই পেট ভরিয়ে ফেললে—ওদিকে ভাল ভাল জিনিসগুলোই যে এখনও বাকি রয়ে গেছে—

, বাড়ির আসল কর্তা ছবি; কিন্তু আশুকাকার কাছে যেন ম্রিয়মান হয়ে গেছে। ছাদের এক কোণে দাঁড়িয়ে তদারক করছে- কিন্তু কার্যকর তদারক হচ্ছে না যেন।

খেতে বসেও আশুকাকার শান্তি নেই।

—ও অসোময় গেলাসগুলো একবার দেখো—কার জল চাই, না-চাই -

—এইবার মাংসের পোলাওটা দিয়ে, মাংসের কালিয়াটা নিয়ে এস চট করে -

আশুকাকা মুখ দিয়ে খায়, কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রয়েছে চারদিকে। কিসের পরে কী পরিবেশন করতে হবে, কার পাতে কী নেই—কে খাচ্ছে, কে খাচ্ছে না—সমস্ত—

—ওহে বসন্ত মাংসের কালিয়াটা এই রো'তে আর একবার দেখিয়ে নিয়ে যাও তো - খাও নবনী, -বেশ মাংস দেখে দেখে গোটা চার পাঁচ দাও দিকি এ-পাতে খাও, খেয়ে কেমন রান্না হয়েছে বলতে হবে—

ওজর আপত্তি শুনলে না। আমার পাতেও ঢালালে- নিজেও নিলে অনেকখানি আশুকাকা। আশুকাকা খাইয়ে মানুষ।

ছবি একবার সরু রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমার সামনে এল।

একবার চেয়ে দেখলে আমার পাতের দিকে। কিছু হয়ত বলতে যাচ্ছিল—আশু কাকা বাধা দিলে।

বললে—অটলদা—বুঝলে ছবি—অটলদা আর আমি দু'জনেই মাংস খেতে ভালবাসতাম—একবার কাছারির কাজ শেষ করে অটলদা বললে—আশু, চল আজ একটা খাসী কাটা যাক। অটলদা'র যে-কথা সে-কাজ—খাসী কাটতে হবে—গেলাম মোছলমান পাড়ায়—গিয়ে দেখি...

গিয়ে আশুকাকা কী দেখলে বলা হলো না। রসময়ের পা লেগে আশু কাকার জল শুদ্ধ গ্লাসটা উল্টে গেল।

তারপর সে এক হৈ হৈ কাণ্ড।

জলে, পাতায়, কুশাসনে, এঁটোয় একেবারে একাকার।

আশুকাকা ফেটে পড়লো—দেখলে নবনী, কাণ্ডটা দেখলে—

কিন্তু তা হোক্। আশুকাকার খাওয়া তা বলে নষ্ট হলো না। তখন সবে মাংসের কালিয়া পড়েছিল—তারপরও অনেক কিছু বাকি।

একে একে টোম্যাটোর চাটনি, পাঁপড়ভাজা, দই, মিষ্টি সব এল। আশু কাকা সকলকে খাওয়ালে এবং নিজেও খেলে কম নয়।

হাত ধুয়ে মুখ মুছে পান চিবোচ্ছিলাম। আবার যাবার বন্দোবস্ত করতে হবে।

আশুকাকা হন্তদন্ত হয়ে এসে বললে—নবনী, তুমি, যেন চলে যেও না, একটু দাঁড়াও, তোমার গাড়িতে যাবো যে—

—ও অসোময়, একটা চাঙারীতে বেশ করে সব রকম খাবার সাজিয়ে দাও তো—না, ওর দ্বারা হবে না দাঁড়াও নবনী, নিজেই গিয়ে দেখে-শুনে আনতে হবে—

জিজ্ঞেস করলাম—কী আনবে কাকা?

আশুকাকা চলতে চলতে বললে—তোমার কাকিমার জন্যে কিছু খাবার নেবো বেঁধে—দেখি—

ঊর্ধ্বশ্বাসে আশুকাকা দৌড়ে ওধারে চলে গেল।

আমি দাঁড়িয়ে আছি। ছবি এসে দাঁড়াল পাশে। বললে- কে ও-ভদ্রলোক, নবনী?

আমি প্রশ্ন শুনে অবাক, কিন্তু আমার উত্তর দেওয়াও হলো না। আশু-কাকা সেই মুহূর্তেই এসে পড়েছে। হাতে গামছায় বাঁধা বিরাট এক পোঁট্লা। বললে—চল নবনী—

উঠে বসলো আশুকাকা।

গাড়ি স্টার্ট দিলাম।

আশুকাকার নির্দেশ অনুযায়ী গাড়ি চলেছে।

গাড়ি চলছে—আর আশুকাকা পোঁটলাটা দুইহাতে ধরে বসে আছে।

বললে—সব নিয়েছি নবনী, নেবুর কুচিটাও বাদ দিইনি, থরে থরে খুরিতে, মাটির গেলাসে সাজিয়েছি, মালসায় নিয়েছি পোলাও—আর ..

নিস্তব্ধ রাত। আর একটু পরে নিশুতি হয়ে যাবে সব। গাড়ির ঘূর্ণ্যমান দুটো রবারের চাকার শোঁ শোঁ শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ কানে আসে না। জ্বলন্ত হেডলাইট সামনের অন্ধকারের পাথরে উজ্জ্বল লিপি খোদাই করতে করতে চলেছে—

হঠাৎ প্রশ্ন করলাম—আচ্ছা কাকা, শেষ পর্যন্ত রবিরা তোমাকে নেমন্তন্ন করেছিল তাহলে?

কাকা চমকে উঠলো—কই না, করেনি তো! কখন করলে?

—করেনি

আমি যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলাম না।

ততোধিক দৃঢ়তার সঙ্গে আশুকাকা বললে—না করেনি তো—

কী জানি কেন, হঠাৎ আশুকাকা নিজের মনেই বলে উঠলো—না করলেই বা .

অন্ধকারের মধ্যেই আশুকাকার মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম। পরিতৃপ্তির সঙ্গে পান চিবোচ্ছে। সঙ্কোচ, লজ্জা, কিছু নেই ও-মুখে।

বললে—না করলেই বা নবনী—ওরা কি আর আমায় চেনে- অটলদা চিনতো, অটলদা বেঁচে থাকলে আমাকে নেমন্তন করতে ভুলতো না, তা থাক—ওরা না হয় ছেলেমানুষ—তা বলে আমি তো আর ছেলেমানুষ হয়ে রাগ করে দূরে থাকতে পারিনে—

থামলো আশুকাকা—

গাড়ি মোড় ঘুরছিল। সোজা রাস্তায় পড়ে আশুকাকা আবার আরম্ভ করলে, অনেক ভাবলাম—বুঝলে নবনী, সেদিন তোমার বাড়ি থেকে ফিরে গিয়ে অনেক ভাবলাম। বুঝলাম ছবির তো দোষ নেই—ওরা ছেলেমানুষ, ওরা আমায় চেনে না, কিন্তু আমি যদি ছেলেমানুষী করে নেমন্তন্ন করেনি বলে না যাই সব পণ্ড হযে যাবে যে, সব লণ্ড-ভণ্ড হয়ে যাবে—সগ্যে থেকে অটলদা সব তো দেখছেন—বলবেন, আশু আমাব মায়ের পেটের ভাই না হয় না হলো কিন্তু মায়ের পেটের ভাইএর চেয়ে কম ছিল কিসে? অনেক ভাবলাম, জানো নবনী–শেষে বৌভাতের দিন, ভোরবেলাই গিয়ে হাজির। নিজেব পরিচয় দিলাম নিজেই—কী করবো বলো—

আশুকাকা যা বলে, তা সত্যিই বিশ্বাস করে।

—এবার কোন দিকে যাবো কাকা?

আশুকাকার উত্তর দেবার আগেই মোড়ের মাথায়—হঠাৎ ব্রেক কষতে

হলো। ওদিক থেকে আর একখানা গাড়ি অজান্তে সামনে এসে পড়েছে।

কিন্তু সেই হঠাৎ ব্রেক কষার আকস্মিকতায় আশুকাকার হাত থেকে পোঁটলা গেছে খুলে—আর মাথাটা গিয়ে ঠোকর খেয়েছে সামনের কাঁচের সঙ্গে।

তারপর সে এক কাণ্ড। ডালে, ভাতে, দই, চাটনিতে, মাছ মাংসে অত সাজানো চাঙারি হঠাৎ উল্টে পড়েছে গাড়ির মেঝেতে। ছত্রাকার খাদ্যসামগ্রী জুতোর ধুলোর ওপর মাখামাখি।

-এ কী হোল নবনী—

গাড়ির ভেতরের আলোটা জেবলে নেবে দাঁড়ালাম। আশুকাকার চোখে কখনও জল দেখিনি। এবারও জল নেই, কিন্তু এর চেয়ে বুঝি জল বেরুন ভাল ছিল।

—এ কী হোল নবনী—

তারপর আশুকাকা নিজের হাতে সেই দই, সেই পোলাও, মাংস, মাছ, লুচি, ডাল, যাবতীয় জিনিস আবার ধুলো থেকে আলগোছে তুলতে লাগলো। আর আমি নির্বাক সেই দৃশ্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম। তারপর প্রত্যেকটি ভাত যখন খুঁটে নেওয়া শেষ হলো, আশুকাকা বললে- আচ্ছা নবনী, তুমি তাহলে এসো, অনেক রাত হয়ে গেছে— আমি এটুকু বেশ হেঁটে যেতে পারবো

আশুকাকা পুঁটলি নিয়ে সোজা উঠে এড়িয়ে চলতে লাগলো।

গাড়িটা পাশের গলির ভেতর ঢুকিয়ে মুখটা ঘুরিয়ে নেব। ছোট গলি। অতিকষ্টে গাড়িটা ঘোরালাম।

মনে মনে ভাবছিলাম। আশুকাকা বলেছিল, কাকিমা মারা গেছে —না খেতে পেয়ে মারা গেছে। তবে এ কোন্ কাকিমার খাবার বেঁধে নিয়ে গেল কাকা। মিথ্যে কথা বলবার লোক তো নয় আশুকাকা। তবে কি কাল সকালে উঠে নিজেই খাবে? কিংবা হয়ত সে কাকিমার মৃত্যুর পর আবার এক কাকিমার আবির্ভাব হয়েছে। আশুকাকা হয়ত বিয়ে করেছে দ্বিতীয় পক্ষে। হয়ত মাথার দিব্যি দিয়ে বিয়ে করতে বলে গিয়েছিল মরবার সময়। হয়ত অবক্ষণীয়া শ্যালিকাই দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী হয়ে এসেছে। কী জানি!

গলি থেকে বেরিয়েই ডানদিকে বড় বাসা একটা।

সেইখানে সেই রাত্রির দ্বিপ্রহরে আমি যেন ভূত দেখলাম।

একটা ডাস্টবিনের ধারে বসে আশুকাকা পুঁটলী বাঁধছে। থরে থরে মাছ, মাংস, রসগোল্লা, সন্দেশ, দই সাজিয়ে রাখছে চাঙারিতে। আশুকাকার দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রীর জন্যই হয়ত! গাড়িটা থামিয়ে দেখলাম। দেখতে

লাগলাম। আশুকাকাই তো। কোনও সন্দেহ নেই—

—আশুকাকা—ডাকলাম।

আশুকাকা আমার দিকে চাইলে। বড় কাতর সে চাউনি।

—কে? নবনী?—বেশ স্পষ্ট মনে আছে আশুকাকার গলা।

—হ্যাঁ, কিন্তু তুমি, এখেনে?

গাড়ির দরজা বন্ধ করে নামলাম। কৌতূহলের সীমা ছিল না আমার।

কিন্তু কাছে যেতেই একটা ধব্‌ধবে সাদা লোমওয়ালা কুকুর আমাকে দেখে ভয়ে ওদিকে পালিয়ে গেল।

চোখের কানের কী মর্মান্তিক ভুল! আশুকাকা নয়, ছিঃ ছিঃ—লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেল।

নিমন্ত্রিত ইন্দ্রনাথ

আজ রবিবার। শুক্রবারে পাওয়া নেমন্তন্ন খেতে ইন্দ্রনাথ সেই সন্ধ্যে-বেলা বেরিয়ে গেছে। এখন রাত সাড়ে ন'টা হতে চললো। এখনও দেখা নেই ইন্দ্রনাথের।

কুমুদ বেশ আলগা করে শাড়িটা পরেছে। এলিয়ে দিয়েছে পা জোড়া। হেলান দিয়েছে দেয়ালে। ইন্দ্রনাথের একখানা মাত্র দিশি কাপড়, সে-খানাকে সেলাই করতে বসেছে। তা বলে সেলাই করাটা কুমুদের একটা ছুতোই বলতে হবে। কুমুদ সেলাই করতে করতেই হাসলে। চারখানা কাপড়ে যাকে বছর চালাতে হয়, তার কাপড় সেলাই করা ছাড়া উপায় কি! ডাকলে—বাবলু, ঘুমুলি নাকি—

মুখ তুলে চেয়ে দেখলে কুমুদ। খোকা জেগে বই পড়ছে উপুড় হয়ে শুয়ে।

বাবলু যেন হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে প্রশ্ন করলে—নেমন্তন্ন খেতে বাবার এত দেরি হচ্ছে কেন মা?

একটা ঘরের মধ্যেই তিনটি প্রাণীর এই সংসার কলকাতার এক অতি-অখ্যাত গলির শেষ প্রান্তে মন্থরগতিতে গড়িয়ে চলে। প্রতিদিনকার অতি পরিচিত সূর্য বস্তির ওপাশে তেতলা বাড়িটার ছাদের ওপরে উঠে আসে। তারপর চাকা ঘুরতে থাকে। ইন্দ্রনাথের অফিস যাওয়ার আগের মুহূর্তের ব্যস্ততা, কুমুদের তাড়াতাড়ি গরম ভাতের ওপর গরম ঝোল ঢেলে দেওয়া, তারপর এক ফাঁকে এ'টো হাতটা ধুয়ে নিয়ে পান সেজে বোঁটার আগায় চুন লাগিয়ে দেওয়া। তারপর বাবলুকে স্নান করানো, তাকে খাওয়ানো, নানান কাজ। বাঁধা পথের আয়েস বা অনায়াসগতি যতটুকু, তার একঘেয়েমিও ঠিক ততটাই। উদয়াস্ত একটানা পরিশ্রমের ফাঁকে যখন কুমুদ একটু ভাবতে বসে, কেবল তখনই একঘেয়েমিটা ধরা পড়ে। তাছাড়া এ একরকম অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে কুমুদের। ঠিক ভোর চারটেয় ঘুম ভেঙে যায় তার। যেন ঘড়ির কাঁটাও এমন নিয়ম মেনে চলে না। যখন ঝোল ভাত রান্না শেষ হয়ে গেছে কুমুদের, সেই তখন সূর্যটা ওঠে আকাশে, তখন দিন হয়, তখন পৃথিবীর লোকের কাজকর্ম শুরু হবার কথা।

ইন্দ্রনাথের ছাপাখানার চাকরি।

আটটার সময় হাজিরি। চেতলার এই বস্তিটা থেকে ইন্দ্রনাথের ছাপাখানা

কোন্ না মাইল সাতেক রাস্তা হবে। হেঁটে যেতে দু'ঘণ্টা সময় লাগে বটে, কিন্তু সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামের ছ'টা পয়সা তেমনি যে বাঁচে। সেই ছ'টা পয়সাই কি কম! একটু শীত পড়লে ছ'পয়সায় এক কাপ চা খেতে পারে, না হোলে তো চার ছক চব্বিশ পয়সায় এক সের রেশনের চাল হবে। যুদ্ধে যাদের আয় বাড়েনি, তাদের অতো বেহিসেবি হলে চলবে কেন?

সুতরাং......

সুতরাং ইন্দ্রনাথকে ভোর ছ'টার সময় বেরিয়ে আটটার সময় ছাপাখানায় হাজরে দিতে হয়।

বাবলু বই থেকে মুখ তুলে আবার বললে—বাবার আসতে এত দেরি হচ্ছে কেন মা—

হয়ত প্রথম ব্যাচে বসতে পারেনি ইন্দ্রনাথ। লাজুক মানুষ তো আসলে। না ডাকলেও যে উঠে পড়ে দলে ভিড়ে গিয়ে বসে পড়তে হয়, সে কথা কে শেখাবে ইন্দ্রনাথকে! যাকে কাল ভোরবেলাই আবার ছ'টার সময় ঝোল ভাত মুখে গুঁজে অফিসে বেরুতে হবে, তার অত শখ করে এতো রাত্তির পর্যন্ত আড্ডা দেওয়া কি উচিত! হয়ত দেখা হয়ে গেছে পুরোন বন্ধুর সঙ্গে! বসে বসে আড্ডাই দিচ্ছে সত্যি সত্যি। বাড়ির মানুষদের কথা একেবারে ভুলে গেছে।

কুমুদ সেলাই করতে করতে বাইরের দিকে চেয়ে রাতটা একবার আন্দাজ করলে।

আজকের এই দিনটা, এই রবিবারটা—কত বছর পরে যেন একটা বিরাট ব্যতিক্রম। এমন ক'রে সমস্ত বিকেলটা, সমস্ত সন্ধ্যেটা পা ছড়িয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে কখনও তো কাটায়নি কুমুদ।

আজ কেমন নিশ্চিন্তে কাটিয়েছে সমস্ত বিকেলটা। রান্নাটা সকাল বেলাই সেরে নিয়েছে। দু'বেলার রান্না একবেলা সেরে রাখলে কত সুবিধে। ইন্দ্রনাথ এবেলা আজ খাবে না বাড়িতে। শুক্রবারে বিকেল বেলাই নেমন্তন্ন করে রেখেছেন ইন্দ্রনাথের পুরোন ছাপাখানার মনিব ধরণীবাবু। মাঝখানে একটা দিন শুধু শনিবার। শনিবারে আধরোজের ছুটিতে সাবান কিনে আনা, জুতোর কালিটা ফুরিয়ে এসেছিল, সেটা কেনা, তারপর .....

তারপর সবটাই করেছিল কুমুদ। সোডা আর সাবান দিয়ে গরম জলে, ইন্দ্রনাথের পাঞ্জাবি আর একটা ধুতি কলতলায় আছাড় দিয়ে কাচা, ভাতের মাড় দিয়ে, নীল দিয়ে বিছানার তলায় পাট করে রেখে 'ইস্ত্রি' করে দেওয়াটি পর্যন্ত!

ইন্দ্রনাথ এবেলা বাড়িতে খাবে না, সুতরাং কাজই বা কি কুমুদের। অন্যান্য দিনের মত গা ধোয়া আর চুল বাঁধার সময় না পাওয়ার ব্যাপার নয়।

শাড়িতে, হলুদে, এ'টোতে কাঁটাতে একাকার। বলতে পারো, ভারি তো দুটি প্রাণীর সংসার, তার আবার ভাবনা কিসের। কিন্তু ওই তো ইন্দ্রনাথের নব্বুইটি টাকার ওপর ভরসা। ওই কটি টাকার মধ্যে তো সব করতে হবে। একটু টেনেটুনে সবদিক সামলে না চললে হবে কেন? দুধ তো বাবলু ভালোই বাসে। একটু দুধ ওকে দিতে না পারলে কুমুদের বুকের ভেতরটা হু-হু করে ওঠে। পাশের মাঠটাতে বিকেলে যখন বাবলু খেলা করে, তখন অনেকদিন কুমুদ জানালা দিয়ে চেয়ে দেখেছে। অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে খেলতে খেলতে বাবলু যেন একটুতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। দুই হাঁটুর ওপরে ভর দিয়ে দম নেয় অনেকক্ষণ ধরে।

আর ইন্দ্রনাথ! কতদিন পরে যে আবার তার কপালে এই নেমন্তন্ন খাওয়া, কে হিসেব রেখেছে। যদি হয়ে থাকে তো সে যুদ্ধের আগে। যখন হয় যেন লুচি ভাজার তীব্র একটা গন্ধ নাকে এসে লাগছে। শানাই বাজছে, সাধারণ গেরস্থ বাড়িতেই তিন-চারশো লোকের খাওয়ার আয়োজন হোত। তখন টেকা দিয়ে তিন হাঁড়ি দই, পঞ্চাশটা ল্যাংড়া আম আর তার সঙ্গে তিন কুড়ি 'লেডিগেনি' খাওয়ার যুগ। সে-যুগে কুমুদ নিজেও কতবার নেমন্তন্ন খেয়েছে।

অবশ্য ইন্দ্রনাথের নিজের বিয়ের বৌভাতই হোল না। মানে সবই হোল, শুধু খাওয়া-দাওয়া উৎসবটিই বন্ধ রইল। তারও কারণ ছিল। সে অনেক কথা। কিন্তু কুমুদের বাপের বাড়িতে খাওয়ানো-দাওয়ানোর রেওয়াজ ছিল। জ্ঞাতি গোষ্ঠি নিয়ে অনেক বড় পরিবার। আজ এ-বাড়িতে অন্নপ্রাশন, কাল ও-বাড়িতে বৌভাত, শ্রাদ্ধ, জ্ঞাত্ ভোজন! নিজের বাড়িতে কুমুদ কতবার ভোজ খেয়েছে। বিয়ে হবার সাত দিন আগে থেকে জুটতো এসে আত্মীয়-কুটুমবা। তারপর কোথা দিয়ে কাটতো দিন আর রাতগুলো। ভিয়েন ঘর, বাসর ঘর, আর ছাদ্না তলা। এখনও একলা ভাবতে ভাবতে কুমুদের মনে বর এসে গেছে—দানের সামগ্রী সাজানো রয়েছে আর তারই পাশে হচ্ছে সম্প্রদান, কনের বাপ গরদের জোড় পরে খালি গায়ে মন্ত্র পড়ছে—ওদিকে বেগুন ভাজা পড়ে রয়েছে কলাপাতার ওপর, লোক বসে গেছে ছাদে, গরম গরম লুচি ঝুড়ি ভর্তি নিয়ে এসে দু-চারখানা করে ঝপাঝপ দিয়ে যাওয়া। কুমুদ তখন ছোট। ছেলেদের মধ্যেই বসে পড়েছে খেতে। শাক ভাজা, বেগুন ভাজা, তারপর আসতো নিরামিষ একটা তরকারি। হয় বাঁধাকপি নয়তো কুমড়োর ছক্কা। তারপর একটা ছ্যাঁচড়া। চমৎকার খেতে সেটা। তারপর মাছের কালিয়া, চিংড়ি মাছের মালাই কারি। তারপর একে একে দু'রকম চাটনি পাঁপড় ভাজা, দই, সন্দেশ, পান্তুয়া, দরবেশ......শেষকালে বাঁ হাতে পান আর দু-চারখানা লাল গোলাপী কাগজে ছাপানো পদ্য—রুমাল পদ্য...

ভাবতে ভাবতে কুমুদ পনেরো বছর আগে পৌঁছিয়ে গেল স্মৃতির উজান ঠেলে......

......সেই একবাড়ি লোক, আলো, হাসি, ফুলের মালা, বর কনে, আর সকলের ওপর লুচি ভাজার গন্ধ .....হোক নিজের বাড়ি, না হয় হোক পরের বাড়ি—তবু ওই পরিবেশ. ওই স্মৃতি, কুমুদের সারা মনকে উদাস করে দেয়। আজ এই রাতে ইন্দ্রনাথের পুরোন দিশি কাপড় সেলাই করতে করতে হঠাৎ কুমুদের কী যে হোল! তার মনে হোল ইন্দ্রনাথ এত দেরিই বা করছে কেন অকারণে। পেট ভরে খেয়েছে ইন্দ্রনাথ অনেকদিন পরে। হয়ত একটা পান চিবোচ্ছে। তারপর হেঁটেই আসছে ট্রাম রাস্তা ধরে। কেন মিছিমিছি পয়সা খরচ করবে ট্রামে চড়ে! বাবলুও জেগে রয়েছে। সে-ও বুঝি বাবার কাছে বিয়ে-বাড়ির গল্প শুনবে বলে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে।

ইন্দ্রনাথের তিনকুলে কেউ নেই, তাই একটা নেমন্তন্নও হয় না কুমুদের। তা একপক্ষে ভালো। পরে' যাবার মত একটা ভালো শাড়ি বা ভালো গয়না তা-ই কি কুমুদের আছে নাকি। ইন্দ্রনাথকেই বা কী করে দোষ দেওয়া যায়! যুদ্ধের দৌলতে এত লোকের মাইনে বাড়লো, এত লোক অবস্থা ফিরিয়ে ফেললে, বেচারী ইন্দ্রনাথের আগেও যা ছিল, এখনও তাই। নব্বুই টাকা মাইনে। নব্বুই টাকার হিসেব করতে গেলে ভয় করে কুমুদের। এত বড় যুদ্ধটা যেন ইন্দ্রনাথকে স্পর্শই করলে না। ইন্দ্রনাথ অপাংক্তেয় রয়ে গেল যেন এই যুদ্ধে। তবু ইন্দ্রনাথ খেতে পারে। ভালো খাওয়া খেতে ভালবাসে। মিষ্টি চাটনি হলে থালা চেটে চেটে খায়। সেই ইন্দ্রনাথ এতগুলো বছরের পর বিয়ে-বাড়ি খাবার নেমন্তন্ন পেয়েছে। সকাল থেকে ইন্দ্রনাথের তাই ব্যস্ততার অন্ত ছিল না। বেশি রাত পর্যন্ত জাগতে হতে পারে, তাই দুপুর বেলা একটু ঘুমিয়ে নিয়েছে। বাবলুকে অন্তত সঙ্গে নিয়ে গেলে ভালো হোত। অনেকদিন ভালো মন্দ কিছু খায়নি, আজ খেয়ে আসতো। কিন্তু ধরণীবাবু কি ভাববেন।

তা ধরণীবাবু লোকটি ভালো। ধরণীবাবুর ছাপাখানাতেই তাব প্রথম চাকরি। তিনিই একরকম মানুষ করে দিয়েছেন ইন্দ্রনাথকে। এই যে আজ ইন্দ্রনাথ 'এরিয়ান প্রেসে' নব্বুই টাকা মাইনে পাচ্ছে, এ ওই ধরণীবাবুরই শিক্ষার গুণে। ধরণীবাবুর ওখানেই ছ' মাস বিনা মাইনেয় কাজ করে সাত মাস থেকে পনেরো টাকা করে পেতে শুরু করে।

সেই ধরণীবাবুর সঙ্গে হাজরা রোডের মোড়ে সেদিন হঠাৎ দেখা।

ধরণীবাবু মোটরে করে আসছিলেন. আর ইন্দ্রনাথ রাস্তা পার হচ্ছিল।

ধরণীবাবুর ডাকে ইন্দ্রনাথ থমকে দাঁড়াল। গাড়িটা ততক্ষণে দশ হাত দূরে গিয়ে থেমেছে। ইন্দ্রনাথ দৌড়ে সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই ধরণীবাবু

বলেছিলেন—পুলিনের—আমার বড় ছেলের বিয়ে আজ, রোববারে বৌভাত, যেয়ো ইন্দ্রনাথ—ভুলো না—

তারপর......

—কেমন আছো, কোথায় কাজ করছ আজকাল......ইত্যাদি ইত্যাদি।

ধরণীবাবু মোটরে ব'সে আর ইন্দ্রনাথ রাস্তায় দাঁড়িয়ে।

শব্দ করে ধোঁয়া উড়িয়ে ধরণীবাবু মোটর হাঁকিয়ে চলে গেলেন, কিন্তু তখনও ইন্দ্রনাথ সেইখানে দাঁড়িয়ে আছে। এ তার হোল কি! কাল রাত্রে স্বপ্নেও তো ভাবেনি কেউ তাকে নেমন্তন্ন করবে। বহুদিন পরে সুযোগ পাওয়া যাবে ভালো মন্দ খাওয়ার।

এই হলো নেমন্তন্নর ইতিহাস।

এমন ঘটনা সচরাচর ঘটে না। ক্বচিৎ কদাচিত। সেই শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে ইন্দ্রনাথের আয়োজন। একটা ফরসা ধোপদুরস্ত ধুতি, একটা পাঞ্জাবি আর জুতোর কালির। হলোই বা ধরণীবাবুর পুরোন প্রুফরীডার। সে যুগের পনেরো টাকার প্রুফরীডারের ছাপ তো আর গায়ে লেগে নেই। আর দশজন ভদ্রলোকের সঙ্গে যেন এক হয়ে একাকার হয়ে যাওয়া যায়। একসঙ্গে খেতে বসলে তো তার পাতায় একটা সন্দেশ কম পড়বে না তা বলে।

কুমুদ সেলাই করতে করতে আর একবার জানালার বাইরের দিকে চেয়ে রাতটা আন্দাজ করলে।

কিন্তু এত রাতই বা কেন হচ্ছে মানুষটার। বাবলু একমনে পড়ে চলেছে। বাবার জন্যে সে-ও জেগে রয়েছে এত রাত পর্যন্ত। বড় রাস্তার খাবারের দোকানের রেডিওটা এখন বন্ধ হয়ে গেল। রাত গভীর হচ্ছে।

হঠাৎ দরজার কড়া নড়ে উঠলো—খটাখট্—খটাখট্--

—খোকা--

ইন্দ্রনাথেব গলা। ইন্দ্রনাথের গলা যেন কেমন আড়ষ্ট আড়ষ্ট। একমুখ পান খেয়ে ডাকলে যেমন হয়।

বাবলু উঠে পড়েছে বিছানা ছেড়ে।

কুমুদ কাপড়টা পাশে সরিয়ে রেখে উঠে দরজা খুলে দিয়েছে তাড়াতাড়ি।

ইন্দ্রনাথ ঢুকলো।

কুমুদ দেখলে যা ভেবেছে সে তাই সত্যি। এক মুখ পান। কালো ঠোঁট জুড়ে পানের লালিমা। পান চিবুচ্ছে ইন্দ্রনাথ। নড়তে পারছে না সে। পেট ভরে খেয়ে অনেকখানি রাস্তা হেঁটে এলে যেমন হয়। ইন্দ্রনাথ যেন ক্লান্ত। ভরপেট খাওয়ার ক্লান্তি।

বিছানার ওপর বসে পড়ে বললে—ঘুমোওনি তোমরা এখনও—

তারপর বাবলুর দিকে ফিরে বললে—তুমি এখনও জেগে আছ বাবা—

বলে খোকার মাথায় হাত বুলাতে লাগলো।

—এই তোমার কাপড়টা সেলাই করছিলাম—কাপড়টা কুঁচিয়ে তুলতে তুলতে বললে কুমুদ।

—কী রকম খাওয়ালে বাবুরা—জিগ্যেস করলে কুমুদ।

ইন্দ্রনাথ হাই তুলছিল আরাম করে। হাই তোলা শেষ করে বললে—বেশ খাওয়ালে, রান্নাবান্না বেশ হয়েছিল—

বাবলু জিগ্যেস করলে—পদ্য আনোনি বাবা—

—পদ্য? আজকাল কি পদ্য হয়রে বোকা ছেলে—ইন্দ্রনাথ আদর করলে একটু অনুকম্পার সুরে।

কুমুদ তখন পাশে বসে পড়েছে। বললে—বাড়ীটা খুঁজতে কষ্ট হয়নি তো—নতুন বাড়ীতেই বিয়ে হোল তো—

—না কষ্ট হবে কেন—ইন্দ্রনাথ বললে—বিয়ে বাড়ী খুঁজতে কি কষ্ট হয়, আধ মাইল দূরে থেকেই লুচি ভাজার গন্ধ আসে নাকে—

—লুচি গরম ছিল?—কুমুদ হঠাৎ জিগ্যেস করলে।

ইন্দ্রনাথ বললে—প্রথম যে ক'খানা পাতে ছিল সেগুলো ঠাণ্ডা—পরে গরম এল, দু'চারখানা ক'রে গরম গরম দিয়ে যেতে লাগলো—পরে পোলাও দিয়ে গেল—সরু বাঁকতুলসী চালের পোলাও—চপ্‌চপে ঘি—

শুধু লুচি নয়, পোলাও হয়েছিল! তা' ধরণীবাবু শৌখীন বড়লোক, খাওয়াবেন বৈ কি! তা'তে আবার বড় ছেলের বিয়ে। পোলাওটা না করলেই বরং অস্বাভাবিক হোত।

ইন্দ্রনাথ জিগ্যেস করলে তোমাদের খাওয়া হয়ে গিয়েছে?

—কখন—কুমুদ উত্তর দিলে।—কোন্ সকালে খেয়ে দেয়ে বাসন মেজে মায়ে-পোয়ে জেগে বসে আছি—

—কেন জাগতে গেলে আমার জন্যে—আমার তো খাওয়ার হাঙ্গামা নেই, কাল থেকে তো আবার সেই রাত চারটের সময়ে ওঠা—

কুমুদ কিছু বললে না। চুপ করে বসে রইল।

ইন্দ্রনাথ বললে—এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল দাও তো—পোলাওতে খুব ঘি দিয়েছিল কিনা, কেবল জল টানছে—

জল এনে দিলে কুমুদ। জিগ্যেস করলে—কী কী খাওয়ালে ওরা?

—সবাই যেমন খাওয়ায়, বেগুন ভাজা থেকে শুরু ক'রে দই রাবড়ী—

—গোড়া থেকে বলো না গো, একেবারে প্রথম থেকে—কলাপাতা থেকে আরম্ভ কর—

ইন্দ্রনাথ বললে—কলাপাতা তো পাতাই ছিল, তার ওপর একখানা করে বেগুন ভাজা, একমুঠো শাক ভাজা আর খান কয়েক ঠাণ্ডা লুচি—একটু নুন. আর এক টুকরো লেবু—

—তারপর ?

—সবাই গিয়ে বসলুম........বসার পর এক ভদ্রলোক বললেন—এবার তবে আরম্ভ করা যাক্—যেমন বলা আর দেরি নয়, সঙ্গে সঙ্গে লুচি ছেঁড়ার শব্দ.........বেগুন ভাজাটাকে নুন দিয়ে মেখে—

ইন্দ্রনাথ থামলো।

—থামলে কেন, বল—বললে কুমুদ।

—তারপর একজন ঝুড়িভর্তি গরম লুচি নিয়ে জিগ্যেস করে করে ঘুরে গেল—আর ওদিক থেকে ডালের গামলা নিয়ে পাতে ডাল দিতে দিতে চললো আর একজন—

—নিরিমিষ না মুড়িঘণ্ট ?

—দু'রকমই. নিরিমিষটা মুগের আর মুড়িঘণ্ট ছোলার ডালের—দুটোই খেলাম—

কুমুদ হঠাৎ কথার মাঝখানেই বললে—মুড়িঘণ্ট ফেলে কেউ নিরিমিষ খায় ! আমি হলে তো ... তা' যাক্, তারপর ?

—তারপর আর কি—এল একটা বাঁধাকপির তরকারি, কড়াইশুটি দিয়ে—

—চোত মাসে বাঁধাকপি ? কুমুদ অবাক হ'য়ে জিগ্যেস করলে—এখন তো বাঁধাকপি আর ঘাস সমান কুমড়োর ছক্কা তো বাপু করা উচিত ছিল, বেশ ছোলা দিয়ে—ঝাল্-ঝাল্ তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে—যেমন টুনিদি'র বিয়েতে খেয়েছিলাম এখনও মুখে লেগে আছে যেন—

বিয়ের নেমন্তন্নে কুমড়োর ছক্কা না হওয়াতে কুমুদ যেন মুষড়ে পড়লো।

—যাক্, থামলে কেন, বল—

ইন্দ্রনাথের উৎসাহ যেন কমে এসেছে। বললে—তারপর মাছ........

—শুধু মাছ বললেই হোল, কী মাছ, নাম নেই ? কালিয়া না কোর্মা......আমার ন'দা নেমন্তন্ন খেয়ে এসে এমন চমৎকার গল্প করতো, আমরা জেগে বসে থাকতুম ন'দার খাওয়ার গল্প শুনবো বলে—তুমি যেমন খেতেও জানো না, খাওয়ার গল্পও করতে পারো না—

ইন্দ্রনাথ আরম্ভ করলে—কালিয়া আর কোর্মা—দুই-ই রুই মাছের—

—কেমন রেঁধেছিল কোর্মাটা? কোর্মার রঙ হয়েছিল?

—হয়েছিল, কিন্তু চিংড়ির মালাই-কারিটা ভাল হয়নি—ইন্দ্রনাথ উদ্গার তুললে একটা।

—এঃ আসল জিনিসটাই খারাপ করলে? কেন নুন বেশী হয়েছিল বুঝি?

কুমুদ এবার রীতিমত মুষড়ে পড়লো। যেন এ তার নিজের বাড়ীর কাজ।

—কেন জানিনে—ইন্দ্রনাথ বললে—কিন্তু মুখে ভালো লাগলো না, এক টুকরো কামড়ে আর খেতে পারলুম না—

চিংড়ির মালাই-কারি ইন্দ্রনাথ এক টুকরো কামড়ে আর খেতে পারেনি, এ-দুঃখ যেন ইন্দ্রনাথের নয়, কুমুদের। যেন কুমুদই অভুক্ত থেকে চলে এসেছে। বললে—আর সবাই? আর সবাই খেলে?

—কেউ না, কেউ খেতে পারলো না—ইন্দ্রনাথ গম্ভীর গলায় বললে।

দু'জনেই খানিকক্ষণ চুপ।

নিস্তব্ধতা ভাঙলো কুমুদ। বললে—তারপর—

—তারপর চাটনি—পাঁপড় ভাজা—দই—

কুমুদ জিগ্যেস করবার আগেই ইন্দ্রনাথ বললে—দু'রকম চাটনি, একটা আলুবোখরার, আর একটা আদার—

অবাক হয়ে গেছে কুমুদ। বললে—কি বললে? আদার?

—হ্যাঁ, আদার চাটনি—এক নতুন ধরনের। তারপর এল মিষ্টি...... ছ'রকমের—

—ছ'রকম?—কুমুদের গলার স্বরে এবার অদম্য বিস্ময়।

—হ্যাঁ, গুণেছি আমি, ছ'রকম। তিন রকমের সন্দেশ, একটা কড়াপাক, একটা কাঁচাগোল্লা আর একটা জয়-হিন্দ্ সন্দেশ, আর মিহিদানা, লেডিগেনি আর শেষে হোল দরবেশ.........যে যতো পারে—

কুমুদ স্তম্ভিত। মুখে তার কথা নেই। চোখ দুটো পলকহীন ক'রে চেয়ে রইল স্বামীর দিকে। এ-ও কি সম্ভব! সার্থক ধরণীবাবু আর সার্থক তার ছেলের বিয়ে।

অনেকক্ষণ পরে কুমুদের মুখে কথা বেরুল।

—ক'টা খেলে তুমি?

ইন্দ্রনাথ টপ্ করে জবাব দিতে পারলে না। একটু থেমে রইল। তারপর প্রশান্ত গলায় বললে—একটাও না—

একটাও না। কুমুদের কৃপা হোল।

—গোড়াতেই ছাইভস্ম দিয়ে বুঝি বোকার মতন পেট ভরিয়ে ফেলেছিলে ?

—না। ইন্দ্রনাথ গম্ভীরভাবে না বললে।

—তবে ?

ইন্দ্রনাথ পকেটে হাত দিলে। পকেট থেকে বার করলে ছোট একটা পুঁটলি। রুমালে বাঁধা জিনিসটা কুমুদের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে খুলে দিয়ে লজ্জায় অধোবদন হয়ে গেল। বললে—লুকিয়ে লুকিয়ে সবগুলো পকেটে পুরেছিলুম—

রুমালটা কুমুদ হাতে তুলে নিলে।

বাবলু এতক্ষণ পরে উৎসাহিত হয়ে উঠেছে। রূপকথার পক্ষীরাজ ঘোড়া যেন সশরীরে একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বললে—মা, দেখি—

কুমুদ দুই হাতের আঙুল দিয়ে রুমালের গেরোগুলো খুললে। কিন্তু সব মিষ্টিগুলো পকেটের চাপে পড়ে এক বৃহৎ পিণ্ডে পরিণত হয়েছে। সন্দেশ, লেডিগেনি, মিহিদানা, দরবেশ মিলে একাকার। তা'হোক—মিষ্টি তা'তে বিশেষ খারাপ হয় না। কুমুদ দেখলে, বাবলুকে দেখালে। অনেকক্ষণ ধরে। তারপর নাকের কাছে রুমালশুদ্ধু উঁচু ক'রে ধরে নাবিয়ে নিয়ে বললে—বিয়ে বাড়ীর মিষ্টির গন্ধই আলাদা, দেখেছ—

বিয়ে বাড়ীর মিষ্টির গন্ধ সত্যিই আলাদা কিনা ইন্দ্রনাথও একবার শুঁকে দেখলে।

তারপর বাবলুকে বললে—খোকা, একটা সন্দেশ খাবি ?

রাত তখন দেড়টা কি দুটো। ইন্দ্রনাথ বিছানা ছেড়ে উঠলো। চারিদিক নিশুতি।

অত্যন্ত সন্তর্পণে মশারি তুলে বাইরে এল। ছোট জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে ঘরের বিছানায় পড়েছে। কুমুদ অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ক্লান্ত সে। ভোর চারটের সময় উঠে আবার তা'কে উনুনে আগুন দিয়ে ভাত বেঁধে দিতে হবে। খোকা ঘুমোচ্ছে। মাথার বালিশের কাছে কাঁসার বাটি ঢাকা দেওয়া তার সন্দেশ রয়েছে। রাত্রে সে খায়নি। বোধ হয় সকালবেলা সদর-দরজায় বসে পাড়ার ছেলেদের দেখিয়ে দেখিয়ে চেটে চেটে খাবে।

ইন্দ্রনাথ আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে ঘরের পূব কোণে চলে এল। একটা গেলাস নিয়ে কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খেলে। গেলাসটা সম্পূর্ণ উপুড় করে শেষ ফোঁটা পর্যন্ত খেলে। কিন্তু তবু যেন পেটটা ভরলো না, তার মনে হোল। আবার এক গ্লাস জল গড়ালো। কুমুদ না জেগে উঠে আবার দেখে ফেলে তাকে! দ্বিতীয় গ্লাসটাও সম্পূর্ণ শেষ করলে। তবু যেন পেটটা ভরলো না মনে হোল।

তৃতীয় গ্লাস জলটা খেয়ে যেন শান্ত হোল হুতাশন।

মশারি তুলে বিছানায় ঢুকতে যাচ্ছিল, একটু শব্দ হওয়াতে কুমুদ চম্‌কে জেগে উঠেছে।

—কে—কে—কে ?

—আমি, তেষ্টা পেয়েছিল, জল খেলাম উঠে—

—এত জল তেষ্টা—এই তো জল খেয়ে শুলে—

—ইন্দ্রনাথ বললে—পোলাওটা বেশী খেয়ে ফেলেছি, খুব ঘি দিয়েছিল কিনা, তাই জল টানছে—

কুমুদ ঘুমের ঘোরে ইন্দ্রনাথের উত্তরটা বোধ হয় আর শুনতে পেলে না।

তবু পরদিন সকালেও সত্যি কথাটা বলতে বাধলো ইন্দ্রনাথের। ধরণীবাবু তাঁর পুরোন মনিব—বিরাট বড়লোক। শেষকালে তাঁর বড় ছেলের বৌভাতে কিনা এক গ্লাস করে ডাবের জল আর পান সিগারেট খাইয়ে ছেড়ে দিলেন। পকেটে ভাগ্যিস দুটো টাকা ছিল—তাই তো সে দোকান থেকে মিষ্টি কিনে আনতে পেরেছে।

লিলি পালিত

মধুপুরের ঘটনা। নদীর ধার থেকে উনি বেড়িয়ে ফিরছিলেন। মোটা সোটা চেহারা। সঙ্গে প্রায় ছ'সাতটি ছেলেমেয়ে। সবাই এক-দু'বছরের পিঠোপিঠি।

বন্ধু দেখতে পেয়েই লাফিয়ে উঠেছে। বললে—ওই যে, ওই উনি আসছেন—

—কে?

—সেই যাঁকে নিয়ে গল্প লিখেছিলি, সেই......

—লিলি পালিত!

—হ্যাঁ, আয় তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই. ....দেখবি......

কিন্তু তখন আর এড়াবার উপায় নেই। ইচ্ছে-অনিচ্ছের প্রশ্ন করবারও সময় নেই।

বন্ধু বললে -লিলি মাসিমা ভারি ভালো লোক, বাড়িতে গেলে এখন না-খাইয়ে আর ছাড়েন না। ওই অতগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে একটু বিরক্ত হওয়া নেই—আলাদা মানুষ একেবারে—

আমি সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লাম। বন্ধুর মুখ থেকেই একদিন লিলি পালিতের গল্প শুনেছিলাম। যে-রকম শুনেছিলাম, সেই রকমভাবেই লিখেছিলাম গল্পটা। তখন উনি কুমারী। সেই কুমারী লিলি পালিতের গল্পটা যেন ওঁকে সামনে দেখে সমস্ত ওলোট্-পালোট্ হয়ে গেলো। কী লিখেছিলাম স্পষ্ট মনে নেই। গল্পটা এই মুহূর্তে ভাবতে গিয়েও কেমন যেন লজ্জায় পড়লাম।

সে কলকাতার রাস্তার একটা ঘটনা।

লিলি পালিতের চোখ থেকে চশমাটা খুলে ঠিকরে পড়লো গিয়ে ফুটপাতের ওপর। একটা অপেক্ষমান রিক্সার চাকার সঙ্গে ধাক্কা লাগলো শরীরের। লিলি পালিত উপুড় হয়ে মুখ থুবড়ে পড়লো।

বাস থেকে নামতে গিয়ে এ কী দুর্ঘটনা!

কে একজন বুঝি সহানুভূতি দেখিয়ে হাত ধরে তুলতে গেলো। অনেকগুলো লোকের আর্ত চীৎকার কানে এলো তার। মুহূর্তে অকর্মণ্য লোকের ভিড় জমে গেছে। সন্ধ্যার অপসৃয়মান ম্লান আলোয় তার চোখে ধাঁধাঁ লেগে গেলো।

কিন্তু ওই পর্যন্তই। একদণ্ডেই নিজেকে সামলে নিয়ে লিলি উঠে দাঁড়িয়েছে। উঠেই যে-লোকটি হাত ধরে তুলতে যাচ্ছিলো তাকে সজোরে লাগালো এক চড়। লোকটার বাঁ-গালের মাংসের ওপর লিলি পালিতের ডান হাতের প্রখর চড়টা সশব্দে ফেটে চৌচির হয়ে গেলো। তারপর ফুটপাতের ওপর থেকে চশমাটা কুড়িয়ে নিয়ে আবার চোখে লাগালো।

এবার স্পষ্ট সব নজরে পড়েছে।

পেছনে একদল দর্শককে বিমূঢ় করে দিয়ে লিলি পালিত শরু গলিটার ভেতরে ঢুকলো। আপনারা যারা দক্ষিণ কোলকাতায় থাকেন তারা লিলি পালিতকে দেখেছেন। রাস্তায় শখ করে যে-সব মেয়েরা বেরোয় লিলি সে-দলের নয়। নধর শ্যাম শ্রী, চোখে মোটা কাচের চশমা, কণ্ট্রোলের ফরসা মোটা শাড়ি, হাতে কিছু বই খাতা আর গলার কণ্ঠা ঢাকা ছিটের ব্লাউজের ঠিক কেন্দ্রস্থলে ফাউণ্টেনপেনের সোনার ক্লিপটা নজরে পড়ে। শাড়িটা শরীরের আষ্টেপৃষ্ঠে পরিপাটি করে জড়ানো। তাতে হাত দুটোর দর্শনীয় অংশটুকুও দ্রষ্টব্যের বাইরে থেকে যায়। অন্য মেয়েরা দেখলে বলে—আদিখ্যেতা। সাধারণত নজরে পড়বার মত মেয়েই নয় সে—না চেহারায়, না সাজসজ্জায়। রাস্তার চলমান জনতার মধ্যে তাকে দেখলে মনে হয় সে যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে চাইছে। মিশিয়ে যেতে চাইছে লজ্জায় নয়—ঘৃণায়। লজ্জা করবার কী-ই বা তার আছে। পাঁচ-পাঁচি চেহারাটা একটু ভোল ফেরালেই হয়ত দশজনের দ্রষ্টব্য হ'তে পারতো। কিন্তু কোনও লোকটা কি ভালো? অর্থাৎ ঠিক ভাল বলতে যা বোঝায় তা কি কেউ? লোকের চাউনি দেখলেই বোঝা যায়—সহস্রদিক থেকে সবাই তাকে গেলে। জলে, স্থলে অন্তরীক্ষে যেমন লক্ষ লক্ষ জীবাণু মানুষের প্রাণহরণের জন্যে উদ্‌গ্রীব, তেমনি ওরা ক্ষুধার্ত লোলুপ বাঘের মত রাস্তায়, পার্কে ফুটপাতে, সিনেমায় সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়। ওরা ভয়ঙ্কর, ওই পুরুষমাত্রেই ভয়ঙ্কর, চোদ্দ বছরের কিশোর থেকে শুরু করে সত্তর বছরের বৃদ্ধ—কাউকে বিশ্বাস নেই। লিলি সেই ঘৃণায় ম্রিয়মান হয়ে থাকে সারাদিন। সতর্কও কম হয় না। তার তিরিশ বছরের নিষ্কলঙ্ক কুমারীত্বে ওরা দাগ লাগাবে, সেই ভয়ে সতর্কতার সীমা থাকে না এক-এক সময়।

গলির ভেতর চলতে চলতে লিলি শ্বাপদ-সতর্ক কান পেতে শুনতে লাগলো। পেছনে পেছনে কেউ তাঁকে অনুসরণ করছে নাকি!

এমন হওয়া বিচিত্র নয় যে সামনের গলির ভেতর থেকে কেউ বেরিয়ে এসে তাকে অপমান করলো। একটা অবাঞ্ছিত চিঠি দেওয়াও তো অপমানের সামিল! কিম্বা উপযাচক হয়ে অকারণে কথা বলা। কোনও মানে হয় না যে-কথার। অথবা আগে আগে যেমন হতো; যখন লিলির বয়স ছিল কম—স্কুলের পথে যাতায়াতের সময় শিস্ দিত ছেলেরা। প্রশ্রয় তাদের কোনও দিনই দেওয়া হয়নি। সুকঠোর গাম্ভীর্য দিয়ে তাচ্ছিল্যে ঘৃণায় তাদের সব অপচেষ্টা ব্যর্থ করা হয়েছে। কিন্তু এখন প্রতিবাদ করা বুঝি আরো কঠিন। এখন জীবিকার জোয়ালে বাঁধা জীবন। কারণে অকারণে, ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় সারাদিন বহির্জগতে থাকতে হয়। এড়াবার উপায় নেই। ওদের চোখের সামনে থেকেই ওদের অগ্রাহ্য করতে হবে।

সমস্ত শরীরে একটা তীব্র যন্ত্রণা হচ্ছে। কিন্তু হাতের যন্ত্রণাটা যেন তীব্রতর। সেই লোকটা যেখানে ধরে তাকে তুলতে যাচ্ছিল সেখানটায়। স্পর্ধা দেখুন! না হয় পড়েই গেছে সে, বাস-কণ্ডাক্টরদের অভদ্রতার দৌরাত্ম্যে কি আর পা ঠিক রেখে বাসে ওঠা নামা যায়। কিন্তু তা বলে কোন্ সাহসে তার গায়ে হাত দিলে সেই লোকটা! তার সমস্ত শরীর যেন অশুচি হয়েছে বলে মনে হলো।

ছত্রিশের-একের-এক নম্বরে এসে লিলি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কড়া নাড়লো। ভেতরে স্টোভের আওয়াজ হচ্ছে। এত রাত্রে কল্যাণী আবার কি রান্না করতে বসলো।

ছট্‌ফটে মেয়ে এই কল্যাণী। দুম্‌দাম্ করে সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা তার অভ্যেস। কিন্তু আজ যেন সে ধীর মন্থর পায়ে আসছে। এসে ততোধিক আস্তে আস্তে খিল খুলে দিলে।

ইলেক্‌ট্রিক আলোয় লিলির সর্বাঙ্গ দেখে কল্যাণী বললে—এ কি হয়েছে লিলিদি?

—পড়ে গেছ্‌লুম বাস থেকে নামতে গিয়ে।

—ইস্‌স্,—শিউরে উঠলো কল্যাণী,—শাড়িটা ছিঁড়ে গেছে, হাতের কনুইটা ছড়ে গেছে যে---

ওপরে উঠে কল্যাণী টিনচার আইওডিনের শিশি বার করলে। আয়নাতে নিজের চেহারা দেখে লিলি হাসলে। নেহাৎ রাত বলে তাই, নইলে দিনের বেলা হ'লে লোকে হয়ত পাগ্‌লী ভাবত।

লিলি জিজ্ঞেস করলে—স্টোভের আওয়াজ শুনছিলাম, স্টোভ্ জেলে-ছিলি কেন রে?

—এম্‌নি, জল গরম করতে।

—এত রাত্রে গরম জল কী হবে?

কোনও উত্তর দিলে না কল্যাণী। ছট্‌ফটে মেয়ে কল্যাণী—আজ যেন কেমন গম্ভীর গম্ভীর। ভাল করে কল্যাণীর মুখের দিকে চাইলে বটে, কিন্তু লিলিদি'র প্রখর দৃষ্টির সামনে থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলে সে। কল্যাণী যেন ভয় পেয়েছে। চোখের কোণে কালি জমেছে কাজলের মত।

ঢং ঢং করে দশটা বাজলো ঘড়িতে। কিন্তু ঘড়িটার গতিও যেন মন্থর হয়ে এসেছে। দম দেওয়া হয়েছে তো! ও-কাজটার ভার কল্যাণীর ওপর।

—কল্যাণী, আজকে দম্ দিয়েছিলি ঘড়িতে?

পরদা সরিয়ে কল্যাণী এ-ঘরে এসে বললে—ঘড়িতে দম্ দেব কি, কী কান্ড হয়েছে দেখবে এস, লিলিদি—

সত্যি লিলি উঠে গিয়ে দেখলে দেয়ালের ক্লক্ ঘড়িটার গায়ে এক অদ্ভুত কান্ড! একঝাঁক বোল্‌তা এসে একটা চাক্ বেঁধেছে ঘড়ির গায়ে। ইলেক্‌ট্রিক আলোয় দেখা যায় বোলতাগুলো শুঁড় উঁচু করে মানুষ দুটিকে দেখছে তীক্ষ্ম নজরে। মুহূর্তে হয়ত ছুটে এসে হুল বিঁধিয়ে দেবে। বোলতা, সাপ, মৌমাছি, এদের বড় ভয় করে লিলির। প্রতি রোমকূপে যেন এক অস্বস্তিকর শিহরণ অনুভব করলো সে।

কল্যাণী বললে—আজ থাক্, কাল চেষ্টা করা যাবে'খন্—

লিলি পালিত এক কথায় কল্যাণীর গার্জেন।

দু'বছর আগের ঘটনা। কল্যাণীর মা এসে নিজে কল্যাণীকে লিলির হাতে সঁপে দিয়ে গেছেন। পাড়াগেঁয়ে মানুষ, ছেলে হয়নি, ওই কল্যাণীই চাকরি করে মাকে টাকা পাঠায়, মা দেশে থাকেন তাঁর ছোট আর দুটি মেয়ে নিয়ে।

লিলি পালিতের হাত দু'টি ধরে বলেছিলেন—তুমি ওর বড় বোনের মতন, তুমি ওকে দেখো মা।

লিলি পালিতের চালচলন তাঁর ভালই লেগেছিলো। লিলির বয়েস যথেষ্ট হয়েছে বটে, আর কেমন ব্রহ্মচারিণীর মতন জীবনযাপন। চুলে তেল না মাখলে নয়, তাই বুঝি একটু মাখা, তাও আবার গন্ধ তেল নয়। শোবার খাটের মাথার দিকের দেয়ালের গায়ে শ্রীশ্রীমার ছবি—আর বাঁ দিকের দেয়ালে পরমহংসদেবের। গীতা পড়ে রোজ, ছাদের এক কোণে একটা টবে তুলসী গাছ পুঁতে দিয়েছে, তার গোড়ায় নিয়ম করে জল ঢালে। সোমবার মাছ মাংস ছোঁয় না। কল্যাণীর মা এ-সব দেখে মেয়ের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। যা হোক—সাহেবদের অফিসে চাকরি করুক আর যাই করুক, ম্লেচ্ছাচার চলবে না এখানে।

তারপর আড়ালে ডেকে নিয়ে বলেছিলেন—যদি তোমার কথা না শোনে মা, তো আমাকে পত্তর লিখে দিও, আমি পত্তর পেয়েই চলে আসবো—

সেই থেকে কল্যাণীর সম্বন্ধে দুশ্চিন্তার অবধি নেই লিলি পালিতের। প্রথম প্রথম অনবরত চোখে চোখে রাখতো। বেশি পয়সা দিতো না। অফিসের মাইনেটা এনে কল্যাণী সমস্তটা দিতো লিলিদি'র হাতে। তারপর দেশে পাঠানো, হাত-খরচ বাবদ সমস্ত হিসেব রাখতো লিলিদি।

কল্যাণীর বড় সিনেমা দেখবার শখ ছিলো প্রথম প্রথম। সিনেমার ওপর ভারি রাগ লিলি পালিতের। সিনেমা দেখতে গিয়ে একবার তাকে শেষ হবার আগে মাঝখানেই উঠে আসতে হয়েছিলো। কী জঘন্য সব ছবি! মাঝ রাত্রে সে সব দৃশ্য মনে পড়লে লিলির গায়ে ঘাম ঝরে। মাঝে মাঝে বহুদিন আগেকার দেখা ছবির টুকরোগুলো চোখ বুজলেই চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে ওঠে! উঃ, কী অশ্লীল সব আজকালকার ছবি। অথচ উপযুক্ত ছেলেমেয়েদের নিয়ে কত বাপ-মা একসঙ্গে বসে ছবি দেখছে। সব রসাতলে গেলো।

ওই রকম একটা স্বপ্ন দেখে এক-একদিন মাঝরাত্রে হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে যায়। তখন তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে বিছানা থেকে। উঠে আলো জ্বালে। আলো জ্বেলে শ্রীশ্রীমা'র ছবির দিকে মুখ করে হাত জোড় করে অসংখ্য প্রণাম করে। তারপর বাঁদিকের দেয়ালের সামনে গিয়ে পরমহংসদেবের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে আবার অসংখ্য প্রণাম করতে থাকে।

মনে মনে বলে—ঠাকুর আমাব কোনও পাপ নেই, আমার কোনও অপরাধ নেই—আমার মঙ্গল করো ঠাকুর—আমাকে শক্তি দাও, সমস্ত ইন্দ্রিয় জয় করবার শক্তি দাও ঠাকুর—

সর্ব দেবতাকে উদ্দেশ্য করে অসংখ্য প্রণাম সেরে বাথরুমে গিয়ে চোখে, মুখে, ঘাড়ে, কপালে ঠান্ডা জল ছিটিয়ে দেয়। তারপর ঘরে এসে পরদা সরিয়ে ঘুমন্ত কল্যাণীর দিকে চেয়ে দেখে। ঘুমে অচৈতন্য কল্যাণী, কাপড়টা সরে হাঁটুর ওপর উঠে গেছে। বালিশের তলায় একখানা আধখোলা বই-এর একাংশ দেখা যায়। উপন্যাস নাকি? সর্বনাশ! লুকিয়ে লুকিয়ে উপন্যাস পড়তে শুরু করেছে কল্যাণী! ছি-ছি—

আস্তে আস্তে বালিশের তলা থেকে বইখানা টেনে নিলে লিলি পালিত। খোলা পাতাটার ওপর চোখ বুলোলে এক পলক। তারপর লজ্জায়, ঘৃণায়, বইটা সশব্দে বন্ধ করে ফেললে। যা ভেবেছে তাই। ক'দিন কল্যাণীর দিকে নজর দেওয়া হয়নি আর তারই মধ্যে এত বেয়াড়া হয়ে পড়েছে। ছোট টেবলের ড্রয়ারটা টেনে দেখলে। কল্যাণীকে লেখা কোনও অনাত্মীয় পুরুষের চিঠি হয়ত আবিষ্কার হয়ে যেতে পারে। আশ্চর্য কিছু নয়। আজকালকার সিনেমা-দেখা নভেল-পড়া মেয়ে। তার মা লিলি পালিতের হাতে তাকে ছেড়ে দিয়ে গেছে। দায়িত্ব তার কি কিছু কম!

অনেক শিখিয়ে পড়িয়েও কল্যাণীকে ঠিক মনের মত করে গড়া গেলো না।

দুর্বলতা কার না থাকে! মানুষ তো প্রবৃত্তির দাস। সেই প্রবৃত্তিকে শাসন করতে হবে। লিলি কল্যাণীকে অনেকবার বলেছে—যখনই নিজেকে দুর্বল মনে হবে, তখনই শ্রীশ্রীমা'র ছবির সামনে চোখ বুজে প্রার্থনা করবে, বলবে—আমাকে শক্তি দাও মা, আমার কোনও অপরাধ নেই, কোনও পাপ নেই—আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় জয় করবার শক্তি দাও মা—আর দেখবে কোথা থেকে সমস্ত দুর্বলতা চলে গেছে—জড়ত্ব কেটে গেছে—

তারপর নিজের গীতাখানা একদিন পড়তে দিয়েছিলো। যখন হাতে কোনও কাজ নেই, কোনও কিছু পড়তে ইচ্ছে করছে, তখন নভেল পড়ে সময় নষ্ট না করে গীতাখানা পড়। ইহজন্ম, পরজন্ম—জন্ম-জন্মান্তরের কাজ করা হবে।

যেদিন রাস্তায় কল্যাণীকে নিয়ে বেরোয়. চারিদিকে সতর্ক পাহারা দিতে হয় লিলি পালিতকে।

কল্যাণী ছট্‌ফটে মেয়ে। রাস্তায় যখন চলবে, তখন আশেপাশের লোকের দিকে নজর দেবে। অনেক সময় এমন দেখা গেছে কোনও অপরিচিত পুরুষ কল্যাণীর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে, কল্যাণীও চেয়ে দেখছে তার দিকে। এ সমস্ত অসহ্য। এক ধমক দিয়েছে লিলি—চোখ নামা কল্যাণী, চোখ নামা—দ্বিরুক্তি না করে কল্যাণী চোখ নিচু করেছে। আসলে মেয়েটা অবাধ্য নয়—শুধু একটু সংযমের অভাব। তবে আগের চেয়ে এখন অনেকটা শুধরে এসেছে। সিনেমা দেখা বন্ধ করে দিয়েছে—নভেল পড়া বন্ধ। মাঝে মাঝে গীতাখানা নিয়ে বসে। রাস্তায় চলতে চলতে এপাশে ওপাশে চায় না। সাজ-পোশাকেও এখন অনেকখানি শালীনতা এসেছে।

কিন্তু সম্প্রতি যেটা ভাল লাগছে না লিলির, সেটা হচ্ছে কল্যাণীর মন্থরতা। আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নামে। আস্তে আস্তে হাঁটে। কল্যাণী যেন ভয় পেয়েছে। তার চোখের কোণে কালি জমেছে কাজলের মত। লিলিদি'র প্রখর দৃষ্টির সামনে থেকে কল্যাণী তার মুখ সরিয়ে নেয়। কোথাও কোনও গ্রন্থি বেধেছে! তা না হলে কেন এই লজ্জা!

ঢং ঢং করে দুটো বাজলো। রাত দু'টো।

যেন মন্থর জরা-স্থবির বার্ধক্যের পদধ্বনি। যৌবনের দম আর নেই। সেই বোলতার চাকটার কথা মনে পড়লো। কাল যে-কোনও রকমে ওটা সরাতেই হবে। নইলে দম না দিলে ঘড়িটা বন্ধ হয়ে যাবে। কাঁটা ঘুরবে না। সময়ের চাকা অচল হয়ে যাবে যে!

সারা গায়ে টন্‌টনে ব্যথা। লিলি পালিত বিছানা ছেড়ে উঠলো। উঠে

আলো জ্বাললে। তারপর শ্রীশ্রীমা'র ছবির সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ চোখ বুজে প্রার্থনা করলে।—আমাকে সমস্ত অকল্যাণ থেকে মুক্ত কর মা, শক্তি দাও ইন্দ্রিয় জয় করবার—

তারপর প্রণাম সেরে বাথরুমে যাবার জন্যে বারান্দার আলো জ্বাললে। বারান্দার শেষ প্রান্তে স্টোভটা রয়েছে। সাধারণত আজকাল তেলের অভাবে স্টোভের ব্যবহার হয় না। স্টোভের ওপর ছোট প্যান-এ কিছু বুঝি গরম করা হয়েছিলো। এখনও খানিকটা গায়ে লেগে রয়েছে। রঙিন কী একটা জলীয় পদার্থ। গন্ধটা বিশ্রী তেজী। কী এটা! কল্যাণী এটা কী করেছে! কিছু রান্না করেছে নাকি? তবে কি ওষুধ! কিসের ওষুধ?

কল্যাণী নিজের ঘরে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। লিলি পালিতের সারা গায়েও আজ বেদনা। চুপচাপ এসে শুয়ে পড়লো সে। কল্যাণীর তবে কি অসুখ হলো!

সেদিন অপ্রত্যাশিতভাবে সকাল সকাল ছুটি হয়ে গেলো। সচরাচর এমন হয় না। এত দুপুরে আর অকারণ ঘোরাঘুরি না করাই ভালো। লিলি পালিত বাসার দিকে পা বাড়ালো।

কিন্তু সেই দুপুর বেলা দরজার সামনে এসে থমকে দাঁড়াল সে।

ভেতরে এই অসময়ে আবার স্টোভের শব্দ হচ্ছে কেন?

কল্যাণী আজও অফিসে যায়নি।

কড়া নাড়তেই কল্যাণী এসে দরজার খিল খুলে দিলে।

লিলি পালিত কল্যাণীর আপাদমস্তক চেয়ে দেখলে। কল্যাণী স্টোভ বন্ধ করে দিয়ে দরজা খুলে দিতে এসেছে। রোজ রোজ সময়ে, অসময়ে, কারণে, অকারণে তার গরম-জল দরকার হয় কেন?

কোনও ভূমিকা না করে লিলি পালিত সোজা জিজ্ঞেস করলে—আজও অফিসে যাসনি?

তীব্র তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টি লিলিদি'র। সে-দৃষ্টির সামনে ছটফটে মেয়ে কল্যাণী কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। লিলিদিকে অনুসরণ করতে করতে বললে—এক মাসের ছুটি নিয়েছি—

এক মাস? এক মাস ছুটি নিয়ে কী করবি?—বিছানার ওপর হাতের বইখাতাগুলো রাখলে লিলি পালিত। তারপর খাটের ওপরে বসে হাত পাখা নিয়ে হাওয়া করতে লাগলো নিজেকে। শাঁসালো ডাবের মত শরীরটা

ঘেমে উঠেছে। পরিশ্রমেও বটে আর দুর্ভাবনায়ও বটে! আজ একটা বোঝাপড়া করে ফেলতে হবে। ক'দিন থেকে অফিস যাচ্ছে না—অসুখ-বিসুখ হলো নাকি! নিজের কথায় যদি কিছু কাজ না হয়—ওর মা'কেই আসতে চিঠি লিখতে হবে। নিজেকে নিয়ে লিলি পালিতের কোন সমস্যাই নেই। শ্রীশ্রীমা'র কৃপায় সহজ সরল জীবন তার। নিশ্চিন্ত আরামে দিন তার কেটে যায়। কোনোখানে কোন দুশ্চিন্তা নেই। কিন্তু কল্যাণীকে নিয়ে এ কি বিপদ!

কল্যাণী এক ফাঁকে সুযোগ বুঝে ঘর থেকে চলে যাচ্ছিলো।

—থাম্—ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলে লিলি পালিত।

কল্যাণী থামল, কিন্তু সোজা চোখোচোখি চাইলো না।

বিছানা ছেড়ে উঠলো লিলি। ভারি শরীরটাকে টানতে টানতে নিয়ে কল্যাণীর সামনে দাঁড়াল। তার মুখের দিকে গম্ভীর দৃষ্টি দিয়ে বললে—একটু আগেই স্টোভের শব্দ শুনছিলাম, আবার স্টোভ জেবলেছিলি কেন?

কল্যাণী একবার মুখটা উঁচু করে, তারপর নামিয়ে নিলে। উত্তর দিলে না।

—স্টোভ জেবলেছিলি কেন, বল্—লিলি পালিতের গলার স্বর চড়ছে।

পর্দার ও-পাশে স্টোভটা আছে, এখনও হয়ত কাছে গেলে প্যান-এর ভেতর রঙিন জলীয় পদার্থের সন্ধান পাওয়া যাবে। লিলি পালিত স্থির হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো, বিমূঢ় হয়ে গেছে সে। মাথার ওপর দেয়ালের গায়ে ক্লক ঘড়িটিতে ঢং ঢং করে তিনটে বাজলো। অতি মন্থর হয়ে এসেছে শব্দটা। ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখলে সে। বোলতার চাকটা এ ক'দিনে আরো কি বড় হয়েছে। এখনও দম্ দেওয়া হয়নি! শব্দ শুনে মনে হয়—আর বেশীক্ষণ চলবেও না যেন ওটা!

হঠাৎ সেই মুহূর্তে কী হলো কে জানে, ছেলেমানুষের মতন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো কল্যাণী।

লিলি পালিত দুই হাতের শক্ত মুঠোতে ধরে ফেললে কল্যাণীকে, নইলে হয়ত পড়েই যেত!

—কী হয়েছে বল তো আমাকে, তোর জন্যে আমি ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করবো'খন—বল তো কী হয়েছে—জাপটে ধরে রইলো লিলি পালিত।

—সব খুলে বল আমাকে, কিছু লজ্জা করিসনি—আবার বললে।

কিন্তু কান্নায় ভেঙে পড়ছে কল্যাণী। কথা বলবে কেমন করে।

—কথা বল কল্যাণী, না বললে বুঝবো কেমন করে—কল্যাণীর চিবুকটা ধরে মায়ের আদরে উঁচু করবার চেষ্টা করলে।

আরো ভেঙে পড়লো কল্যাণী।

—আমাকে বাঁচাও লিলিদি, সর্বনাশ হয়েছে, বাঁচাও আমাকে লিলিদি—

কিছুটা যেন বুঝতে পারলো লিলি পালিত। বুকের ওপর কল্যাণীকে নিয়ে তেমনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শ্রীশ্রীমা'র ছবির দিকে চাইলে। এ কী সর্বনাশ করলে মা তুমি। আমি মুখ দেখাব কেমন করে! আমার সমস্ত গর্ব, সমস্ত অহঙ্কার কি ধুলোয় লুটোবে। এতদিনের সাধনা কি সব ব্যর্থ হবে মা!

হঠাৎ কল্যাণী নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছে। মুক্ত করে সোজা নিজের বিছানায় গিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগলো। পেছন পেছন লিলি পালিতও গেলো।

—কী হয়েছে, আমকে খুলে বল কল্যাণী—লিলিদি'র কথায় কান্না ওর আরো বেড়ে গেল।

অনেকক্ষণ কল্যাণীর খাটের ওপর বসে রইল লিলি পালিত। কল্যাণীও যেন শান্ত হয়ে এলো একটু।

আব একটু সন্ধ্যে হোক—যখন আরো শান্ত হয়ে আসবে কল্যাণী, তখন ও সমস্ত বলবে।

কল্যাণীকে সেই অবস্থায় রেখে লিলি পালিত উঠলো। গীতা-ক্লাসটা আজ সকাল সকাল সেরে আসলেই হয়। এসে এর একটা মীমাংসা করতেই হবে আজ।

লিলি পালিত উঠলো। এখনও রোদ রয়েছে। ছাতিটা নিলে। একটা নোটখাতা নিলে। তারপর কল্যাণীকে না ডেকে আস্তে আস্তে বাইরে থেকে দরজা ভেজিয়ে রাস্তায় গিয়ে নামলো। এই তো এখুনি আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসবে সে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেরিই হলো তার।

অন্য দিনের চেয়ে গীতা-ক্লাস আজ একটু বেশিক্ষণই হলো। অষ্টম অধ্যায়টা বার বার পড়তে ইচ্ছা করে। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে একটা বই-এর দোকানে কিছুটা সময় নষ্ট হলো। সময় ঠিক নষ্ট হলো বলা চলে না। একখানা ভাল সংস্করণের গীতাব খোঁজ করতে গিয়ে অন্য কয়েকখানা বই নজরে পড়লো। বহুদিন থেকে একটা রামকৃষ্ণ কথামৃত কেনবার শখ ছিল, কিন্তু হয়ে ওঠেনি। হঠাৎ বইয়ের দোকানে সেখানা দেখে কিনতে ইচ্ছে হলো, কিন্তু সঙ্গে বেশি টাকা আনেনি! হতাশ হয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় চলতে চলতে রাণীর সঙ্গে দেখা। অনেকদিন পরে দেখা, সহজে পার পাওয়া গেলো না। এম এ'তে রাণীর ছিলো বাংলা, আর লিলি পালিতের ছিলো সংস্কৃত। বাসে যেতে আলাপ হয়েছিলো। রাণীর সঙ্গে কথাবার্তা

সেরে যখন ফিরছে হঠাৎ মনে পড়লো নোটখাতাখানা গীতা-ক্লাসে ফেলে এসেছে। আবার সেই সেখানে ফিরে যাওয়া। তারপর এমনি করতে করতে যখন বাসার কাছে এসে পেঁছুলো তখন সন্ধ্যে সাতটা।

দরজা সেইরকম ভেজানোই আছে।

লিলি পালিত দ্রুতপায়ে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো, তারপর সেখান থেকেই একবার ডাকলে—কল্যাণী! কোথায় বেরুল না তো! সমস্ত অন্ধকার, ঘরের আলোটা পর্যন্ত জ্বলেনি। একটা বেড়াল লিলি পালিতের পায়ের কাছ দিয়ে নিঃশব্দে ছুটে বেরিয়ে গেলো। বারান্দার জানালা দু'টো খোলা, তা' দিয়ে অনেকদূরের রাস্তার গ্যাসের আলো দেখা যায়। পাশের কাদের বাড়িতে উনুনে বুঝি ধোঁয়া দেওয়া হয়েছে। মুখে চোখে নাকে এসে লাগছে ধোঁয়ার গন্ধ। ডান হাত দিয়ে বারান্দার আলোটা জ্বাললে লিলি পালিত। তারপর ঘরের দরজার দিকে এগিয়ে গেলো। একটা টিক্‌টিকি একেবারে মেঝের ওপর চরে বেড়াচ্ছিল, লোক দেখে দেয়াল বেয়ে একেবারে কড়িকাঠের পাশে গিয়ে আশ্রয় নিলে।

লিলি পালিত কল্যাণীর ঘরের দরজা ঠেললে। ঠেলতেই ভেজানো দরজা খুলে গেছে। একটা কেমন ভিজে গন্ধ এল নাকে। বাঁ হাতে সুইচটা টিপতেই নিবালম্ব, নিঃসম্বিৎ, নিশ্চল হয়ে গেল লিলি পালিত। ঠাণ্ডা অশরীরী দমকা বাতাস খোলা জানালা দিয়ে এসে মুখে চোখে হাত বুলিয়ে দিলে। কঠিন বায়ুভূত মৃত্যু। নিরাবয়ব ভয়। স্থির কঠিন দৃষ্টি দিয়ে লিলি পালিত ওকে দেখছে। কল্যাণী যেখানে ঝুলছে সেইদিকে খাটের একটা কোণে একটা দড়ির যোগসূত্র ভিন্ন আর তো কিছু নেই! জিভটা বেরিয়ে গেছে একহাত। খোঁপাটা খুলে এলোমেলো হয়ে গেছে, পরনের শাড়ি বিপর্যস্ত! ব্লাউজের বুকের কাছটায় নখগুলো বিঁধে আছে! আর চোখের তারা দু'টো ঊর্ধ্বমুখী!

লিলি একবার চেষ্টা করলে চোখ ফিরিয়ে নিতে।

কিন্তু চোখ তার আটকে গেছে, অনেক চেষ্টা করেও চোখ ফেরানো যায় না।

আবদ্ধ দৃষ্টির সূত্রে লিলি পালিত যেন এক অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করলে। যেন তাকে টানছে, ছট্‌ফটে মেয়ে কল্যাণী হঠাৎ যেন যাদুমন্ত্রে নিথর হয়ে গেছে। বড় বীভৎস দৃশ্য। সেই অন্ধকার পটভূমিকায় মৃত্যুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে তার পা দু'টো থর্‌থর্‌ করে কাঁপতে লাগলো। চোখের দৃষ্টির সামনে সমস্ত জগৎ অবলুপ্ত হয়ে গেছে—শুধু বাস্তব নিরবয়ব মৃত্যু যেন আস্তে আস্তে তাকে গ্রাস করতে আসছে।

নিদ্রোত্থিতের মতন একবার সে আশেপাশে চাইবার চেষ্টা করলে।

ও-ঘরে দেয়ালের গায়ে শ্রীশ্রীমা'র ছবির সামনে যাবার চেষ্টা করলে। কিন্তু কী হলো—হাত-পা যেন কে বেঁধে ফেলেছে। কল্যাণী যেন হঠাৎ নড়ছে তার মনে হলো। তার দিকে চেয়ে চোখের ইঙ্গিত করছে, বলছে এস, এস না—

একবার আর্তনাদ করলে হয়ত নির্ভয় হওয়া যেতো। কিন্তু গলা তার শুকিয়ে গেছে।

এবার কল্যাণী যেন দাঁড়িয়ে উঠলো।

আর সঙ্গে সঙ্গে লিলি পালিত এক লাফে ঘরের বাইরে এসেছে। সামনেই দেয়ালের গায়ে ঘড়িটা রয়েছে। সেদিকে চাইতেই নজরে পড়লো তিনটে বেজে ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে। পেন্ডুলাম নড়ছে না। সময় বন্ধ হয়ে গেছে। অচল হয়ে গেছে চাকা। রথ চলবে না।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে কল্যাণীর মুখটা স্মরণ করবার চেষ্টা করলে। কী বীভৎস! কী ভয়ঙ্কর! কী অবধারিত পরিণতি! এখনও বয়স আছে—এখনও রক্তের তেজ আছে—

অন্ধকার হয়ে এসেছে গলিটা। ছুটে চললো লিলি পালিত। আর এক মুহূর্তও নষ্ট করা চলবে না।

রাস্তায় চলতে চলতে বহুদিন আগেকার একটা কথা মনে পড়লো। পাঁচ বছর আগেকার ঘটনা। সে পাঁচ বছর আগে তাকে একটা চিঠি লিখেছিলো। সে চিঠি সেদিন সে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলো, কিন্তু চিঠিটার প্রত্যেকটি লাইন যেন আজও তার চোখের সামনে জ্বল্ জ্বল্ করছে। প্রতিটি লাইন আজও তার মনে পড়ছে। ঠিকানাটাও তার মুখস্থ হয়ে গেছে। আজ এই সর্বনাশের শিখরে দাঁড়িয়ে সেই অতল অধঃপতনের গহ্বরে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে লিলি পালিত।

সময় বন্ধ হয়ে গেছে। অচল হয়ে গেছে চাকা। রথ চলবে না

কিন্তু এখনও সময় আছে এখনও বয়স আছে—এখনও রক্তের তেজ আছে—

তাড়াতাড়ি একটা চলতি বাসে উঠে পড়লো লিলি পালিত। এই বাসে চড়ে শহরের একেবারে উত্তর প্রান্তে যেতে হবে তাকে।

বাসের 'লেডিস্ সিটে'র এককোণে বসে লিলি পালিতের সমস্ত শরীর রোমাঞ্চে উষ্ণ হয়ে উঠলো। এমন কখনও হয় না। হয়তো না-চলা পথ প্রদক্ষিণ করতে হবে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। তবু বেশ লাগছে এই রোমাঞ্চ। সমস্ত শরীরে যেন উচ্ছল হ'য়ে উঠছে রেখার ঢেউ। বাসের এলোমেলো দোলানি লেগে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন নেশার ঝোঁকে খিল্ খিল্ করে হাসছে। চলন্ত বাসের মধ্যে বিপরীতমুখী হাওয়া এসে তার

মুখে চোখে চুলে এলোপাতাড়ি চুম্বন করতে লাগলো। লিলি পালিতের মনে হলো কেউ যেন তাকে আলিঙ্গনের মধ্যে আবদ্ধ করেছে—যত ছাড়াতে চায়, সে কিছুতেই ছাড়বে না। অথচ তার ভালো লাগছে। আশ্চর্য! তার বেশ ভালো লাগছে!

শ্যামবাজারের শেষে বাস থেকে নেমে হাঁটতে হয়! কিন্তু তাতে দেরি হবে। একটা রিক্সা করলে। পাঁচ বছর আগেকার চিঠি! তখন কেন গেলো না সে! এতদিন অনেক সময় বয়ে গেছে পায়ের তলায়, অনেক তারা খসে গেছে মাথার ওপর। এখন সে যদি চিনতে না পারে! যদি বাড়ি বদলে থাকে! যদি প্রত্যাখ্যান করে!

নির্ধারিত ঠিকানায় এসে রিক্সার ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে লিলি পালিত বাড়ির সামনে একবার তাকালো দ্বিধাভরে। চারিদিকে অন্ধকার। জনবিরল শহরতলীর অখ্যাত পাড়া। শহর এখানে শান্ত হয়ে ঝিমিয়ে পড়েছে। তারপর আশেপাশে তাকিয়ে দেখলে। কেউ কোথাও তাকে লক্ষ্য করছে না। আস্তে আস্তে হাত বাড়িয়ে দরজার কড়া নাড়তে লাগলো।

ভেতরে যেন কী শব্দ হচ্ছে!

স্টোভ জ্বলার শব্দ।

এখানেও স্টোভ! সেই চেনা আওয়াজ। যেন এখানেও মৃত্যুর আয়োজন চলছে। অপমৃত্যুর আয়োজন। এখানে এত দূরে পালিয়ে এসেও যেন অপমৃত্যুকে এড়াতে পারেনি লিলি পালিত।

আবার একবার কড়া নাড়তেই কে যেন দরজা খুলে দিলে।

একজন চাকর গলা বাড়িয়ে দেখে নিয়েই বললে—মা দাই এসেছে -

—এসে গেছ মা? এসো এসো—একজন মহিলা এগিয়ে এলেন এবার।

আবার বললেন—আমার মেয়ের বেলায় সরোজিনী এসেছিল, সে তো এ-পাড়া থেকে এখন উঠে গেছে,—তা এসো মা, দাঁড়িয়ে কেন, ভেতরে এসো—

একজন বৃদ্ধা মহিলা। কথা শুনে যেন এক-পা পেছিয়ে আসতে হলো।

লিলি পালিত কোন রকমে বললে—হিরণবাবু আছেন?

—হিরণ তো ডাক্তারবাবুকে খবর দিতে গেছে, এই এলো বলে, তবে তোমাকে ডাক্তারবাবুই বুঝি খবর দিয়েছে? তা এসো মা, ভেতরে চলে এসো, জুতো ওইখানেই থাক্, ওষুধটা খেয়ে এখন একটু আরাম হয়েছে বোধহয়, বৌমা এখন একটু শান্ত হয়েছে, আমি তো তাই হিরণকে বলছিলাম—আমরাও তিনটে ছেলেমানুষ করেছি মা, তবে হিরণ বললে, দাই থাকা ভালো, তা আমি বললাম—আমাদের সে-কালে ও নার্সও ছিল

না, দাইও ছিল না, তারপর ভেবে দেখলাম, প্রথম পোয়াতি......থাক্ মা থাক্, ওই যে পাশের ঘরে.. ...আমি জল গরম করছি—তোমার যা চাই বলো. .. .

লিলি পালিত ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে গেল।

এক রোগিনী বিছানায় অসাড় হয়ে পড়ে আছে। চোখ বন্ধ, যন্ত্রণায় যেন একটু আগেও ছটফট করেছে। মহিলা গলা নিচু করে বললেন—বিয়েব পব তিন বছর তো ছেলেপুলে হলো না, আমি ভাবলাম, আর বুঝি হবেও না, কত পুজো-মানত করে যদি-বা হচ্ছে তো কত কষ্ট দেখা মা—এখন ভালোয় ভালোয় হয়ে গেলে বাঁচি, কালীতলায় পুজো দেব মনের মত কবে—

লিলি পালিত কী যে করবে বুঝতে পারলে না। এখন কি পালিয়ে যাবে সে? মৃত্যু সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা তার হয়েছিল, কিন্তু এ যে আরো ভয়ঙ্কর। আরো বীভৎস।

লিলি পালিত বললে—একটু জল দেবেন আমাকে?

সেই তখন থেকে সমস্তক্ষণ উত্তেজনার মধ্যে কাটিয়ে যেন কণ্ঠ তার শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে খাঁ-খাঁ করছে।

মহিলা বললেন -ওই যে সাবান রয়েছে. জল রয়েছে, হাত ধুয়ে নাও মা, আমি সব ব্যবস্থা কবে রেখেছি মা, তোমরা পাশ-করা মেয়ে হলে কি হবে, আমবা সেকালেব লোক, ঠাকুমা-দিদিমার কাছে সব শিখেছি, আমরা সেকালে

—না, জল আমি খাবো!

হঠাৎ বাইরে যেন কার গলার আওয়াজ হলো।

মহিলা বললেন—ওই হিরণ এলো বোধহয় ডাক্তারবাবুকে নিয়ে—দেখি—

অনেকদিনের চেনা গলা। চিনতে তবু কষ্ট হবার কথা নয়।

বাইবে হিরণ বলছে—আপনি ভেতরে যান, আমি এখনি ওষুধটা আনছি—

বাইরে কোথাকার কোন্ ডাক্তারবাবু! এ-কোন্ অজ্ঞাত অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে সে এসে পড়লো। দেয়ালের গায়ে একটা ছবি। হিরণ দাঁড়িয়ে রয়েছে আর পাশে চেয়ারে বসে বধূবেশী হিরণের স্ত্রী। আজকের ওই রোগিনী।

মহিলা বললেন—তোর নার্স এসে গেছে বাবা, বৌমার কাছে গিয়ে বসেছে—বৌমা ভাল আছে এখন—

হিরণের গলা—নার্স! নার্সকে কে আবার খবর দিলে? আমি তো. .

—ও-বাড়ির পরেশকে বলেছিলুম, সেই হয়ত......তা দেরি করিস নে যেন আবার—

হিরণ বললে—এখন কেমন আছে মা?

—তুই কিছু ভাবিসনে বাবা, ডাক্তারবাবু এসে গেছে, দাই এসে গেছে, এখন ভগবানকে ডাকছি, মা কালীকে মানত্ করছি—

কথাটা বলে হিরণ চলে গেল।

আর তারপরেই ডাক্তার ঢুকলো ঘরে। একেবারে অচেনা অজানা মুখ।

ঘরে ঢুকেই বললেন—ও, আপনি এসে গেছেন ভালোই হয়েছে, টেম্পারেচারটা নিয়েছেন?

টেম্পারেচার। ছোট টেবিলের ওপর থার্মোমিটার পড়ে ছিল একটা। সেটা নিয়ে লিলি পালিত বললে—আমি নিচ্ছি—

– আর—

ডাক্তার বললেন— আর রাত্তিরে বোধহয় আমাকে থাকতে হবে, ডেলিভারি না-হওয়া পর্যন্ত, যদি অপারেশন করতে হয়, আপনি খাওয়া-দাওয়া.

হঠাৎ রোগিনী যেন যন্ত্রণায় আবার ছটফট করে উঠলো। যেন বুকের ওপর পাথর চেপে কেউ পিসে ফেলছে তাকে। যেন যন্ত্রণা-সমুদ্রের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে শরীরের কূলে কূলে। শরীর ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। অসহ্য সে-দৃশ্য। অদ্ভুত সে-অনুভূতি। লিলি পালিত মৃত্যু দেখেছে, এবার দেখছে জন্ম। যেন দুই-ই সমান। মৃত্যু ও জীবন যেন মহাপ্রাণের এপিঠ-ওপিঠ। লিলি পালিতের মনে হলো—এ যেন হিরণের স্ত্রী নয়, কল্যাণী। যেন কল্যাণীর মৃত্যু বেদনা সে চোখের সামনে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করছে। যে-কল্যাণী নিজের কলঙ্ক মুছে ফেলতে চেয়েছিল, সেই কলঙ্কই যেন আজ সগৌরবে ফুল হয়ে ফুটবে। পুনর্জন্মের আগে এ যেন সেই মৃত্যু-বেদনা। যাকে মৃত্যু বলে চরম বলে জেনেছিল লিলি পালিত, তা যেন একটু-একটু করে মরছে। যন্ত্রণা সয়ে সয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুর মধ্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এসো মৃত্যু এসো— অমৃতের দূত এসো। লিলি পালিতের জীবনে এ-এক নতুন অঙ্গীকার।

ডাক্তার বললেন–ধরুন তো একটু . ..

তারপর শুরু হলো সেই জীবন-মৃত্যুর শাশ্বত সংগ্রাম। মৃত্যু বড় না জীবন বড়। যেন জীবন-মৃত্যুর মধ্যে মহাদ্বন্দ্বের সমাধান হবে আজ। লিলি পালিত কান পেতে রইল। অনেক দূর, সুদূর থেকে যেন অমৃত-দূত এসেছে। যেন স্পষ্ট কথা পেলে তার চেহারা। চিত্তপাবন, মরণ-সাধন অমৃত দূতের রূপ। কোনও ভূষণ নেই, ভাষণ নেই। অপ্রিয়, অকুণ্ঠ, অপরূপ, অকলঙ্ক। সমস্ত রাত্রি ধরে অমৃত দূতের তপস্যা করছে যেন

লিলি পালিত। এক মহা-তপস্যার আয়োজন আর আড়ম্বর যেন হয়েছে এখানে। সমস্ত রাত ধরে যেন সে সেই সাধনা সাধন করতেই এসেছে।

শেষ রাত্রের দিকে ডাক্তারের কথায় আবার জ্ঞান ফিরে এল তার।

ওপাশে ঘরের বাইরে যেন শাঁখ বাজালেন শাশুড়ি।

ডাক্তারের সঙ্গেই লিলি পালিত সকাল বেলা বেরিয়ে এসেছিল।

হিরণ সামনে এসে বললে—আপনার—

হাতে তার কয়েকটা টাকা।

ডাক্তার টাকা নিলেন। বললেন—বিকেল বেলা একবার খবর দেবেন—

লিলি পালিত চলেই আসছিল নিঃশব্দে।

হিরণ তাকেও টাকা দিতে গিয়ে কেমন থমকে দাঁড়ালো—

—তুমি .. আপনি. . . .

লিলি পালিত ডাক্তারের পেছনে পেছনে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল। বলতে চেয়েছিল—'আপনি আমায় বাঁচালেন'—কিন্তু বলতে গিয়েও কথাটা তার গলায় আটকে এল। হিরণের মা তখনও শাঁখ বাজিয়ে চলেছেন। লিলি পালিতের মনে হলো—ও যেন শাঁখের শব্দ নয় শুধু, ও তারও জীবনের মঙ্গল শংখ।

হঠাৎ কাছে এসে পড়লেন উনি-

বন্ধু নমস্কার করে বললে—আমার এই বন্ধুর সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই মাসিমা—

আমি কিন্তু তখন অন্য কথা ভাবছি। ভাবছি এ কোন্ লিলি পালিত। কোন্ লিলি পালিতের গল্প লিখেছি আমি তখন! আমি তো সেদিন ঠিক চিনতে পারিনি কিম্বা সেই ঘটনার পর হয়ত এমনি আলাদা মানুষই হয়ে গেছেন। কে জানে!!

হাত তুলে নমস্কার করলাম।

লিলি পালিত বললেন—তোমার এই বন্ধুটি খুব লাজুক বুঝি বাবা, কিন্তু আমার কাছে কোনও লজ্জা করতে পারবে না তোমরা, মাসীমার কাছে আবার লজ্জা কিসের বিকেল বেলা যেও, চা খেতে হবে ওখানে—কেমন ?

বলে চলে গেলেন।

বন্ধু বললে—বিয়ে করার পর থেকেই এই রকম আলাদা মানুষ হয়ে গেছেন, এখন লিলি মাসিমা পুরুষমানুষদের ডেকে ডেকে আলাপ করেন, বাড়িতে নেমন্তন্ন করেন, গেলে আর ছাড়তে চান না—আশ্চর্য !

আর এই ছেলেমেয়ে ?

বন্ধু বললে—ওরা বছর-বছর হচ্ছে, স্বামীটি তো বুড়োমানুষ, বুড়ো বয়েসে এমন স্ত্রী পেয়ে বেঁচে গেছে মানুষটা !

অসতী

আজো এক এক সময় পদ্মার কথা ভেবে মনে হয় ছোট সংসারের নির্মম আবেষ্টনীতে চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ের মা হওয়ার চেয়ে হোটেলের দক্ষিণের সেই সাজানো ঘরটাতেই যেন পদ্মাকে মানিয়েছিল ভাল। কিন্তু তবু এখনও আমার দ্বিধা যায়নি। পদ্মার সমস্ত কাহিনীটাই এক এক সময় রহস্য মনে হয় আমার। পদ্মার আত্মত্যাগটা কেউ বোধ হয় কল্পনাও করতে পারে না। না পারে ইন্দুবাবু, না পারে চণ্ডীদাস, না আমি। পদ্মার ছেলেমেয়েরা, তারাও হয়ত কেউ না।

ঘটনাটা গোড়া থেকেই বলি।

মাস এগারো একটা অফিসে চাকরি করেছিলাম। সেই এগারো মাসেই যেন এগারো বছরের ঘনিষ্ঠতা জন্মে গিয়েছিল সহকর্মীদের সঙ্গে। তা সে খানিকটা আমার আড্ডাপ্রিয় স্বভাবটার জন্যেও বটে আর খানিকটা বোধ হয় 'খরচে' স্বভাবের জন্যেও।

সিগ্রেট দিয়েছি ডাইনে বাঁয়ে। ঠিক কেরানির পোশাকও পরিনি কোনও দিন।

ইন্দুবাবু বলতেন—আপনি কেন চাকরি করতে আসেন মশাই?

অফিসে আসবো তা-ও ঠিক সাড়ে দশটার মধ্যে আসতে পারবো না। রোজই লেট। আর রোজই বেপরোয়া। এমন সহকর্মী বোধ হয় আগে এরা কখনও দেখেনি।

যাহোক সে অফিসে চাকরি এখন আর করিনে। এখন সেই সাত আট জন সহকর্মীদের সঙ্গে দেখাও আর হয় না। তাদের কথা মনেও পড়ে না আমার।

হঠাৎ দেখা হয়ে গেল ইন্দুবাবুর সঙ্গে একদিন। রাস্তায়।

ইন্দুবাবু নমস্কার করে দাঁড়ালেন, বললেন—কেমন আছেন—আমাদের যে আর চিনতে পারেন না।

বললাম—সে কি—

আমাদের সেই ইন্দুবাবু! কিছু না হোক দিনের মধ্যে তিরিশবার অকারণে টিফিন-রুমে গিয়ে ঘুরে আসতেন। আর সেই গুঁফো বটব্যাল—। সেই চণ্ডীদাস—পানের বাদশা। বিনা পয়সায় কিছু পেলেও নেবে না। অদ্ভুত সংযম আর ভদ্রতা-জ্ঞান। সকলকে এক কাপ চা খাওয়াচ্ছি, সেই সময় যদি বলতাম—চণ্ডীদাস, চা হবে নাকি? চণ্ডীদাস একটা পান বার করে মুখে পুরে বলতো—না ভাই, আমার এই পানই ভালো। আর সেই ভাগবত ঘোষ কথায় কথায় বলতো—কই ছাড়োনা একটা সিগ্রেট—। আর বসন্ত—বাঁ হাতটা কাটা—চব্বিশ ঘণ্টা একটা চাদর জড়িয়ে থাকতো অফিসে।

—কেমন আছেন? আর সকলের খবর কী?

ইন্দুবাবু বললেন—আবদুল সাহেব মারা গেলেন—আর আমিই তারপর থেকে হেড ক্লার্কের চেয়ারে—

বললাম—খুব সুখবর—শুনে সুখী হলুম।

ইন্দুবাবু তারপর বললেন—আর গুঁফো বটব্যালের গোঁফজোড়া আরো জবর হয়েছে—আর ভাগবত ঘোষ, তার দারিদ্র্য আর এ জীবনে ঘুচলো না—

ইন্দুবাবু বাকী সকলের পরিচয়ও দিলেন।

শেষে বললেন—কিন্তু চণ্ডীদাসকে চিনতেন তো?

বললাম—খুব চিনি, সেই যে পান খেতো মরে গেলেও একটা পয়সার জিনিস কারো কাছে নিতে চাইতো না—ভারি সংসারী মানুষ, অফিস-ফেরতা বাজার করে ফিরতো—গোছানো মানুষটি—

ইন্দুবাবু বাধা দিয়ে বললেন—সে চণ্ডীদাস একেবারে বয়ে গেছে মশাই—একেবারে গোল্লায় গেছে—

—বলেন কী? আমাদের চণ্ডীদাস, আপনার ঠিক মনে আছে তো?

ইন্দুবাবু বললেন—হ্যাঁ আমাদের সেই চণ্ডীদাসই, এখন মদে একেবারে দিনরাত চুর হয়ে থাকে—

ঠিক নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যেন। সেই চণ্ডীদাস। ব্রাউন কেডস জুতো পায়ে, মালকোঁচা মারা কাপড়, হাতকাটা টুইল শার্টের ওপর একটা কোটও পরে আসতো। অল্প মাইনেতে বেশ পরিপাটি ছিল চণ্ডীদাস, অপব্যয়ের মধ্যে ছিল শুধু পান। আর একটু দোক্তা। কিন্তু ছোট একটি এলুমিনিয়মের খাবার-কৌটাতে থাকতো কোনও দিন পরোটা বেগুনভাজা। আবার মাসের শেষাশেষি প্রায়ই থাকতো মুড়ি মুড়কি জাতীয় জিনিস। সেই চণ্ডীদাস!

ইন্দুবাবু বলতে লাগলেন—এখন একেবারে বদলে গেছে মশাই, আপিসে প্রায়ই এক মাস দেড় মাস কামাই, আমি সামলে সুমলে রেখেছি চাকরিটা—আর তা ছাড়া জানেন তো রেলের চাকরি—ও যায় না, তাই সেটা এখনও

আছে, কিন্তু ওর বউ ছেলেপুলে বোধ হয় খেতে পায় না।

দুজনের মুখেই খানিকক্ষণ কথা বেরুল না।

খানিক পরে ইন্দুবাবু বললেন—আপনাকেই একটু শ্রদ্ধা করতো চণ্ডীদাস আমাদের মধ্যে—তা সে যা হোক—এরকম বেলেল্লাগিরি যে চণ্ডীদাস করতে পারে ভাবাও যায় না—আমরাও সে যুগে একটু-আধটু যে ও-সব না খেয়েছি তা নয়—কিন্তু ডুবি নি তো কখনও—বলুন হ্যাঁ কি না।

আমি তখনও অবাক হয়ে ভাবছি। কী আর বলবো! ঠিক যে সহানুভূতি তা নয়, কিন্তু এমন বিচিত্র ঘটনার জন্যে মানুষের মনে কৌতূহলও তো হয়।

ইন্দুবাবু চলে যাচ্ছিলেন। যাবার আগে বললেন—একদিন যাবেন না চণ্ডীদাসের বাড়ি, একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলে আসবেন না—আপনার কথা হয়তো শুনতেও পারে—

তারপর আরো দু'একটা কথার পর চলে এলাম। একি বোঝাবার জিনিস—না কেউ বোঝালে বোঝে। বুঝিয়ে কাউকে শোধরানো যায় না সংসারে। কিন্তু ঘটনাটা শুনে পর্যন্ত তাজ্জব হয়ে গেলাম।

চেতলার বড় রাস্তাটা বাজারের কাছে যাবার আগেই বাঁদিকের গলির ভেতর চণ্ডীদাসের বাসা। যাবো না মনে করেও কেমন করে যে চণ্ডীদাসের ঠিকানায় গিয়ে পড়লাম নিজেও জানিনে তা।

সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। নম্বরটা মিলিয়ে নিয়ে কড়া নেড়ে ডাকলাম—চণ্ডীদাস বাড়ি আছো—

ভেতরে ছেলেমেয়েদের গলা শুনতে পাচ্ছি।

মেয়েলী গলায় কে যেন বললে—পুঁটি, বলে দে বাবা বাড়ি নেই।

একটি ছোট মেয়ে দরজা খুলে দিলে।

মেয়েটি কিছু বলবার আগেই বললাম—তোমার নাম বুঝি পুঁটি?

মেয়েটি অবাক হয়ে গেল। বললে—আপনি আমার নাম জানলেন কি করে?

—কার সঙ্গে কথা বলছিস রে পুঁটি—রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে সন্ধান করতে গিয়ে একেবারে সামনাসামনি পড়ে গিয়ে যিনি এ'টো হাতে ঘোমটা দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন তাঁকে দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। এই চণ্ডীদাসের স্ত্রী। অন্ধকারেও বুঝতে পারলাম এমন রূপ গরীবের

ঘরে কদাচিৎ দেখা যায়। চণ্ডীদাসটা [illegible] হতভাগা।

নমস্কার করে বললাম—আমি চণ্ডীদাসের বন্ধু।

—আপনাকে তো আমি কাল বলেছি।

সামলে নিয়ে মহিলা বলতে আরম্ভ করলেন—আপনাকে তো আমি কাল বলেছি এ সময়ে তার দেখা পাওয়া যায় না।

প্রতিবাদ করতে হলো। বললাম—কাল তো আমি আসিনি, আপনি বোধ হয় অন্য কাউকে ভুল করছেন।

আরো সব ছেলেমেয়েরা সামনে এসে তখন ভিড় করেছে। আমার প্রতিবাদ শুনে বিশ্বাস করলেন কি না কে জানে। রান্নাঘরের কী একটা কাজে আবার ভেতরে ঢুকে গেলেন।

ততক্ষণে ছোট ছেলেটা পকেটের মধ্যে গোটা হাতটা পুরে দিয়েছে। বললে—পয়সা আছে তোমার পকেটে ?

বলতে বলতে সত্যিই পকেট থেকে গোটা দুই খুচরো টাকা বের করে নিয়ে চোঁ চোঁ দৌড় দিয়েছে।

ভেতর থেকে আমার কথার উত্তর এল—ও পুঁটি, বলে দে, টাকা আপনি পাবেন না, জেনেশুনে অমন মাতাল মানুষকে টাকা ধার দেন কেন ?

টাকা যে আমি ধার দিইনি তা বলবার অবসর দিলেন না। দুটো রুপোর টাকা নিয়ে তখন কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে ছেলেমেয়েদের। একটা চুল ধরেছে আর-একটার, আর একটার জামা ধরেছে আর একজন। একটা হট্টগোল বেধে গেলো। কান্না, চড়, চাপড়, কিল।

রান্নাঘর থেকে এবার বেরিয়ে এলেন তিনি। এসেই কাণ্ড দেখে ধমক দিলেন।

—পল্টু, তুমি না বড় হয়েছো, বুদ্ধি হয়েছে না তোমার, দেখতে পাচ্ছ না, পুঁটিকে যে মেরে ফেললে ছোট খোকা—

হঠাৎ পেছনে ফিরে আমাকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। বুঝতে পারেন নি এখনও আমি আছি। শাড়িটা সামলে নিয়ে বোধ হয় দরজার পাল্লা দুটো বন্ধ করবার জন্যেই এগিয়ে এলেন। কিন্তু আমি দরজার পাল্লা দুটোর মধ্যে দাঁড়িয়ে। আমি না সরে দাঁড়ালে দরজা বন্ধ হয় না। সরেই চলে আসতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ মহিলা বলে উঠলেন—আপনারা কি মানুষ না কি, আমি তো আপনাদের বলেছি ওঁকে টাকা দেবেন না—টাকা চাইতে আপনার লজ্জা হয় না—যদি বিশ্বাস না হয় তো দেখে যান।

তারপরে এক কাণ্ড করে বসলেন। প্রায় আমার হাত ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে যাবার মতই।

সোজা নিয়ে গেলেন রান্নাঘরের সামনে। বললেন—কী রাঁধছি দেখেছেন, মাছের ঝোল না মাংসের কালিয়া—বলুন কী দেখছেন—পাঁচটি ছেলেমেয়ে নিয়ে ওই আমরা খাব—আজকে আমাদের ভাত হবে না।

কচুর শাক—তাই সেদ্ধ করে রান্নার বন্দোবস্ত হচ্ছে একটা কড়ায়।

—দেখলেন তো, এবার আসুন—বলে মহিলাটি শোবার ঘরে গেলেন। একখানাই বোধ হয় ঘর। বললেন—আলমারি কটা, আর কটা খাট, কটা সিন্দুক দেখছেন বলুন।

একটা উঁচু প্যাকিং কেস ছিলো, তারই ওপর বসে পড়লুম।

বললেন—তিনটে ঘর ভাড়া ছিলো, বাড়িওয়ালা দুখানা নিয়ে নিয়েছে, এখানাও নিলে বাঁচে—ছ'মাসের বাড়ি ভাড়া বাকি থাকলে তার দোষ কী! এসব জেনে শুনেও আপনারা কেন অমন মানুষকে টাকা ধার দেন—আমাদের মেরে ফেললেও যে টাকা পাবেন না।

যেন এতক্ষণেও সম্পূর্ণ প্রমাণ হলো না। তারপর বললেন—আমার দিকে চেয়ে দেখুন তো—

সোজা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ চেয়ে দেখলাম।

—ক'গাছা চুড়ি দেখছেন আমার হাতে? এ-শাঁখা দুগাছা, তা এই বা আর থাকে কেন—

হঠাৎ হাত দুটো দেয়ালের গায়ে ঠুকে শাঁখা দুটোও পট্ পট্ করে ভেঙে পা দিয়ে মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে দিলেন।

আমি সত্যিই আর দেখতে পারছিলাম না। ওঠবার উদ্যোগ করছিলাম।

—পল্টু আবার বিছানা ময়লা করছে, পুঁটি দেখতে পাচ্ছ না—তোমার না বুদ্ধি হয়েছে, তুমি না—আপনি উঠছেন নাকি?

—হ্যাঁ, কিন্তু আমি চণ্ডীদাসকে টাকা ধার দিইনি, আপনি ভুল বুঝেছেন—এমনি ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম—চলি আমি—চলতে চলতে বললাম।

এতক্ষণ পরে যেন মহিলাটি আমার দিকে ভালো করে নজর দিয়ে দেখলেন।

—এই টাকা দুটো আপনার নিয়ে যান। হ্যাঁ আর কাকেই বা বলি—নিজেরা খাই না-খাই, আপনাদের—পাওনাদারদের জ্বালায় তো আর পারিনে। যাই আমার তরকারি বোধ হয় পুড়ে গেল ওদিকে।

গলির অন্ধকারের মধ্যে পা বাড়ালাম।

অন্ধকার গলি। ক'ফুট রাস্তা পার হলেই বড় রাস্তা। বড় রাস্তায় আলো পাওয়া যাবে। এত সরু গলি, পাশাপাশি দু'জন যাওয়া যায় না। গলিটার শেষ প্রান্তে এসে পড়েছি, হঠাৎ সামনেই যেন মনে হলো চণ্ডীদাস ডাকছে!

চিনতে পারলাম। চিনতে না পারলেই বোধ হয় ভালো করতাম। কিন্তু তখন অত বুঝিনি।

ডাকলাম—চণ্ডীদাস—

চণ্ডীদাস মাথা উঁচু করে আমার দিকে চাইলে! যেন অনেক কষ্টে চিনতে পারলে।

বললে—চেনা লোক যেন—

মাতালের কাণ্ড। চিনতে পেরেই একেবারে জড়িয়ে ধরেছে বুকে। বললে—আর ছাড়ছিনে তোমায় ভাই—শুনেছি ব্যবসা করে খুব বড়লোক হয়েছ—তা হওগে বড়লোক—এস আমাব বাড়ি এস।

হিড় হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে গেল একেবাবে নিজের বাড়ির সামনে। কিছু কথা বলবার অবকাশ দিলে না, দরজা খুলে দিতেই চীৎকার করে ডাকলে—পদ্ম, পদ্ম, পদ্মাবতী—

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন স্ত্রী। চুপ করে দেখতে লাগলেন চণ্ডীদাসের কাণ্ড।

—ভাগ্যিস আজ সকাল-সকাল এলাম, তা খুব বড়লোক বন্ধু বুঝেছ পদ্মা। ব্যবসাদার—খাতির করো গো—বলে পকেট হাতড়াতে লাগলো চণ্ডীদাস। সিকি একটা বেরুল শেষ পর্যন্ত পকেট থেকে।

বললে—পল্টু কোথায়, যা তো বাবা, একটা রসগোল্লা আর এক কাপ চা নিয়ে আয় তো কিনে—হ্যাণ্ডেলওয়ালা চায়ের কাপ নিবি—এই নে—চল বসি গিয়ে ঘরে—আমাদের অফিসের খবর শুনেছ তো—ইন্দুটা মাইরি বড়বাবু হয়ে গিয়েছে—বড় জ্বালায়, কেবল উপদেশ দিতে আসে—আরে যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ।

পল্টু সিকিটা নিয়ে খাবার আনতে দৌড়ুচ্ছিল। পদ্মা এক নিমেষে তার হাত খপ্ করে ধবে ফেলেছে। তারপর এক মুহূর্তে আমার একেবারে সামনে সরে এসে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললে—আমার মাথার দিব্যি রইল, যদি আপনি ঐ রসগোল্লা খান—বলুন, এত শোনার পরেও আপনার খেতে রুচি হবে—বলুন—বলুন আপনি।

চণ্ডীদাস হঠাৎ মাথা খাড়া করে একবার আমার মুখের দিকে একবার পদ্মাব মুখের দিকে চাইলে। কী যেন সে বুঝতে পারলে না।

তারপর স্ত্রীকে লক্ষ্য করে হয়ত একটা কটূক্তি করতে যাচ্ছিল চণ্ডীদাস।

আমি থামিয়ে দিলাম। বললাম—এই তো চা খেয়েই আসছি এখন চণ্ডী—থাক না এখন—অন্য দিন বরং—

হঠাৎ যেন ভারি মিইয়ে গেল চণ্ডীদাস। আমাকে টানতে টানতে শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো। বললে—দেখলি ভাই, দেখলি তো—এই রকম বউকে নিয়ে ঘর করতে হয় আমাকে—কেউটে সাপের সঙ্গে সংসার করা সাধ করে কি আমি মদ খাইরে!

রান্নাঘরেই চলে গিয়েছিল পদ্মা। কথাটা কানে যেতেই আবার ফিরে এসেছে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললে—সংসার আর করতে হবে না তোমায়, এই দেখ।

ভাঙ্গা শাঁখার টুকরোগুলোকে মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিয়ে সেগুলোকে আরো টুকরো টুকরো করে বললে শাঁখাটা ছিলো হাতে—তাও আজ ভাঙলাম এই শনিবার সন্ধ্যেবেলা সংসার করা তোমার ঘুচবে—ঘুচবে—ঘুচবে।

তালে তালে শাঁখার টুকরোগুলোর ওপর পদ্মা ডান পা দিয়ে আঘাত করলে তিনবার। তারপর আবার রান্নাঘরে চলে গেলো।

ছেলেমেয়েগুলো যে অত দুষ্টু, চণ্ডীদাস বাড়িতে আসার পর থেকেই সবাই যেন ভয়ে কুঁকড়ে আছে।

চণ্ডীদাস একটা বালিশ এগিয়ে দিয়ে বললে—ভালো করে আয়েস করে বোস না ভাই—তারপর তোর খবর কী বল—চাকরিতে আর সংসারে ঘেন্না ধরে গেছে ভাই, আর সংসারতো দেখলি—চোখের সামনে। বাবা রূপসী মেয়ে দেখে বিয়ে দিলে,—আমায় বলে—তোমার হাতে না পড়লে রাজরাণী হয়ে থাকতুম তো যা না—দেখিনা, কোন রাজা তোকে পোষে।

তারপর হঠাৎ আদরের সুরে ডেকে উঠলো চণ্ডীদাস—পদ্ম—পদ্মা—পদ্মাবতী—

সুরের পরিবর্তনে আমিও যেন চমকে উঠলাম। পদ্মাও বেশ আশ্চর্য হয়েছিলো। ছেলেমেয়েদের খাওয়াতে খাওয়াতে উঠে এসে দাঁড়ালো দরজার সামনে। বললে—কি বলছো?

মদ খেয়ে চণ্ডীদাসের কী কাণ্ডজ্ঞান থাকতে নেই? বললে—এই দেখছ একে—রাজা ছেলে—রাজা রাজা করছিলে—রাজা এনে দিয়েছি—এখন রাজরাণী হও।

ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে পদ্মা চলে গেল নিজের কাজে। নিজেরই যেন কেমন কদর্য লাগলো ইঙ্গিতটা। প্রসঙ্গ এড়াবার জন্য বললাম—মদটা তুমি ছাড়োই না চণ্ডীদাস।

হঠাৎ যেন খানিকক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইলো চণ্ডীদাস আমার দিকে।

তারপর গলায় কোঁচাটা জড়িয়ে গলবস্ত্র হয়ে বললে—তুইও উপদেশ দিচ্ছিস ভাই আমাকে—তাহলে কোথাও নিস্তার নেই দেখছি।

আমার মুখ থেকে উপদেশ শুনে যেন ক্ষোভে দুঃখে ঘৃণায় হঠাৎ মা মা বলে চীৎকার করে উঠলো চন্ডীদাস। তারপর লজ্জায় যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে চায় এমনিভাবে বিছানায় চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়লো। আর উঠলো না।

চুপচাপ চন্ডীদাসের পাশে বসে রইলাম একলা। পদ্মার বিছানাটার ওপরই বসেছিলাম। বাইরের ফালি বারান্দায় পাঁচটি ছেলে মেয়েকে নিয়ে খাওয়াতে বসেছে পদ্মা। কী এতক্ষণ খাচ্ছে ওরা। খেতে বুঝি দু'একজন আপত্তি করছে। গুম গুম করে কয়েকটা কিল পড়লো তাদের পিঠে। কান্না জুড়লো কয়েকজন।

তারপর হিড়হিড় করে টানতে টানতে এনে ঘরে পুরলো সবাইকে।

সকলকে জায়গা করে দেবার জন্যেই বললাম—এবার আমি উঠি—রাতও অনেক হলো- আসবো আরেক দিন।

পদ্মার মুখ থেকে কোন সম্ভাষণ বেরুলো না। আমি একলা বাইরে এসে জুতো পরে গলির অন্ধকারে পা বাড়ালাম।

—শুনুন—

অন্ধকারেও অনেকখানি চলে গিয়েছি। মনে হলো পেছন থেকে যেন পদ্মা ডাকলে। সামনে এগিয়ে এসে পদ্মার মুখোমুখি দাঁড়ালাম।

শাড়িটা গায়ে ভালো করে জড়ানো। ফরসা মুখের দিকে চাইতে গিয়ে একটা প্রচন্ড আঘাত পেলাম। দেখি নিরাভরণ ডান হাতটা এগিয়ে দিয়েছে সামনের দিকে।

বললাম—কী ওটা—

পদ্মা বললে—আপনার মনি-ব্যাগটা আমার মাথার বালিশের আড়ালে ফেলে রেখে গিয়েছিলেন—নিন।

নিতে গিয়েও কেমন দ্বিধা হলো। সত্যি সত্যিই তো এমন করে ধরা পড়বো ভাবতে পারিনি।

পদ্মা যেন ধমকের সুরে বললে—সোজাভাবে দিলেই পারতেন—এ ছলার তো কোন প্রয়োজন ছিলো না। আমার অভাব, এতো কারো অজানা নেই নিন, দেরি করবেন না, আমার আবার অনেক কাজ পড়ে আছে।

হঠাৎ পদ্মার হাতটা চেপে ধরলাম। বললাম—কিছু মনে করবেন না কিন্তু, এতে যে কটা টাকা আছে তা নিতেই হবে আপনাকে—একান্ত অনুরোধ।

দশখানা পাঁচ টাকার নোট উপড়ে করে দিতেই এক নিমেষে পাঁচখানা

নোট ফেরৎ দিয়ে বললে—টাকা আমার দরকার সেকথা অস্বীকার করিনে, কিন্তু এত টাকা একসঙ্গেও দরকার নেই—দেখছেন তো বাক্সটার তালা ভাঙা, একে একে সবই তো কেড়ে নিয়েছে—আপনি যদি আর কখন না-ই আসেন, এই টাকাতেই তো একটা মাস চালিয়ে নিতে হবে—

কিছু একটা কথা বলতে যাচ্ছিলাম। বাধা দিয়ে পদ্মা বললে—তা'ছাড়া আমার হাতে প্রকাশ্যে টাকা দিতে আপনার লজ্জা পাওয়াটাইতো লজ্জাকর—আপনারাই ওকে এই পথে নামিয়েছেন, কত টাকা ও ব্যয় করেছে আপনাদের জন্যে, এখন তার সিকিও শোধ হলো বলে ধরে নেবেন না হয়—

গলির এই গহন অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে দোযাবোপের একটা উত্তর দেব বলেই প্রস্তুত হচ্ছিলাম। কিন্তু এক মুহূর্তে পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিলে পদ্মা। বললে—আচ্ছা, অনেক রাত হয়ে গেলো, আপনি এখন বাড়ি যান—

বলে মুহূর্ত মাত্র দেরি না করে দরজার পাল্লা দুটো দড়াম করে বন্ধ করে দিলে।

বেশীদিন অপেক্ষা করতে পারিনি। পুজোর জন্যে নিজের সংসারের কিছু কেনাকাটা করতে হচ্ছিলো। সেই সঙ্গে চণ্ডীদাসের কথা মনে পড়লো।

কয়েকটা ফ্রক পেনি, কোট প্যান্ট আর পদ্মার জন্যে একখানা ভালো শাড়ি,আর ব্লাউজ নিয়ে একদিন চেতলার বাজারের গলিতে গিয়ে হাজির। বাইরে থেকেই বোঝা গেলো ভেতরে তুমুল কাণ্ড।

কড়া নাড়তেই পল্টু এসে দরজা খুলে দিলে। বললে—ওমা, কাকাবাবু—

কিন্তু ভেতরে দৃষ্টি দিতেই মনে হলো এমন সময় আমার আসা ঠিক হয়নি বোধ হয়।

উঠোনের মধ্যেই চণ্ডীদাস প্রায় অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় শুয়ে আছে। আর পদ্মা বালতি বালতি জল ঢালছে মাথার ওপর। জল ঢালতে ঢালতেই একবার বললে—দেখুন আপনার বন্ধুর কাণ্ডটা—

চণ্ডীদাসের জ্ঞান নেই, উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। পদ্মার মুখের ভাব আর ছেলেপিলেদের হাবভাব দেখে মনে হলো এ যেন এ-বাড়িতে নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার।

অনেকক্ষণ ধরে জল ঢালবার পর চণ্ডীদাস যেন একবার পাশ ফিরে শুলো।

পদ্মা বললে—একটু হাত লাগাতে পারবেন—পাঞ্জাবির আস্তিনটা

গুটিয়ে নিন—আপনার বন্ধুকে ঘরে তুলে নিয়ে যেতে চাই—বলে শাড়ির আঁচলটা কোমরে শক্ত করে জড়িয়ে নিলে।

পদ্মা বললে—আপনি পায়ের দিক ধরুন—আমি এদিকে আছি—

অতি যত্নে পদ্মা চণ্ডীদাসের আপাদমস্তক শুকনো গামছা দিয়ে মুছিয়ে দিলে। তারপর দুজনে মিলে প্রায় অচৈতন্য চণ্ডীদাসকে ঘরে তুলে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। বিছানায় শুইয়ে চণ্ডীদাসের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে পদ্মা জিজ্ঞেস করলে—এখন কেমন আছো?

চণ্ডীদাস কী বললে কানে এল না। পদ্মা একটা পাখা নিয়ে বাতাস করতে লাগলো মাথার কাছে। আর এক হাতে মাথার চুলগুলোর ভেতর আঙুল চালিয়ে চালিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করলে। বললে—এবার বুকের কষ্টটা একটু কমেছে কী বলো? একটু ঘুমোতে চেষ্টা করো দিকি—

কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম জানিনা। ছেলেমেয়েগুলো ছুটোছুটি করছে। এক একবার পকেটে হাত পুরে দেয়। কিন্তু প্রথম দিনের অভিজ্ঞতার পর পকেটে কিছু আর রাখিনি।

অনেকক্ষণ পরে পদ্মা আস্তে আস্তে স্বামীর পাশ থেকে উঠলো। ছেলে-মেয়েদের যার যার বিছানায় শুইয়ে দিলে। তারপর আমার দিকে চেয়ে বললে—আপনি যেন অবাক হয়ে গেছেন মনে হচ্ছে—

প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। চণ্ডীদাসের মদ খেয়ে বেহুঁশ হওয়া না পদ্মার এই স্বামীসেবা কোনটা পদ্মা বলতে চায়?

আমার উত্তর দেবার আগেই বললে—এই এখানে পিঁড়িটাতে বসুন একটু—আমি পাঁচ মিনিটে দুটো ছাই পাঁশ মুখে দিয়ে নিই—

রান্নাঘরের মধ্যে গিয়ে খেতে বসলো পদ্মা। আমার চোখের আড়ালে।

খেতে খেতে বললে লোকটা লম্পট হলে কী হবে যখন ভালো থাকে তখন আবার অত ভালোও কেউ নয় জানেন-সেদিন আপনার বন্ধু কি বলছিলো জানেন

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

বলছিলো মাতালরা মদকে যত ঘেন্না করে এমন আর কেউ না-কিন্তু ঐ মানুষটাই মদ খেলে অমন হয়ে যায় কেন এ আমায় কে বলে দেবে। লোকটার ওপর রাগ হয় আমার জানেন মাঝে মাঝে মনে হয় লোকটাকে বুঝি ভালোই বাসি—সাত পাক দিয়ে মঙ্গলঘট সাক্ষী রেখে বিয়ে হয়েছে বলেই নয় মনে হয় লোকটা বুঝি বড় দুর্বল বড় অসহায় ও-

কথা বলতে বলতে এক সময় খাওয়া শেষ করে কয়েকখানা বাসনও মেজে নিলে। তারপর এসে বসলো আমার পাশের একটা উঁচু পিঁড়িতে। আশেপাশে উঁচু উঁচু দোতলা তিনতলা বাড়ির পাহাড়। একতলা বাড়ির

নিচু খোলা বারান্দায় বসে আছি। ঘর থেকে চণ্ডীদাসের প্রচণ্ড নাক ডাকার শব্দ আসছে। টিপ টিপ করে বৃষ্টি এলো। চারদিকে ভনভন করছে মাছি।

পদ্মা বললে—ঐ মোষের মত নাক ডাকা শুনতে পাচ্ছেন অসহ্য লাগছে বটে কিন্তু তা লাগুক তবু তো মানুষটা বাড়িতে রয়েছে হোক মরা মানুষ তবু ধরুন না কেন ওরই তো স্ত্রী আমি, এখন এই যে দুপুরবেলা একজন পর-পুরুষের সঙ্গে বসে বসে গল্প করছি—ওর তো সে খেয়ালও নেই—

তারপরেই একটু থেমে বলতে লাগলো সুন্দরী বলে আমার নাম আছে বাপের বাড়িতেও ছিলো, শ্বশুর বাড়ি পাড়াতেও আছে আপনার মত ওর বন্ধু বান্ধবই এসেছে একবারে বাড়িতে, দুদণ্ড বসে আমার সঙ্গে আলাপ করতেও চেয়েছে কিন্তু মানুষটার মনটা কি আলাদা ধাতুতে তৈরী, আমাকে বাড়িতে একলা ফেলে রেখে চার পাঁচ দিন বাড়িতেই এলো না হয়ত

– থাকগে বাজে কথা আমার জন্যে কী আনলেন দেখি—পদ্মা কাপড়ের বাণ্ডিলটা নিয়ে খুলতে লাগলো।

ভালোই করেছেন, এখন তো কাপড় এনে। মাপে ঠিকই হবে মনে হচ্ছে—

নিজের শাড়িখানা পাট খুলে দেখলে খানিকক্ষণ। বললে মনে হচ্ছে এটা পরে আজই আপনার সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাই - তাই চলুন, যাবেন?

অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে। আকাশ কালো হয়ে এসেছে। পদ্মার এ হলো কী!

– নিয়ে যাবেন ? সাহস হবে তো বলুন এখনি বেরিয়ে পড়ি—সবাই তো ঘুমুচ্ছে এখন। কত দিন কত বছর যে রাস্তায় বেরোইনি

ছোট কুমারী মেয়ের মত চঞ্চল হয়ে উঠলো পদ্মা।

তারপর আমার সম্মতির অপেক্ষা না করেই ঘরের ভেতর গিয়ে শাড়িটা জড়িয়ে, চুলটা আঁচড়ে পরিপাটি হয়ে বেরিয়ে এলো। বললে কী হলো - চলুন- ভাবছেন কি—

বললাম-কাজটা ভালো হচ্ছে কি না একবার ভেবে দেখুন আমি দু'দিনের চেনা—বলতে গেলে আমি আপনার কাছে অজ্ঞাতকুলশীল তো-

পদ্মা চলতে চলতে বললে তা বলে আপনি তো আর আমায় খেয়ে ফেলবেন না, আর খেয়ে ফেললেও ওই ছেলে-মেয়েগুলোরই যা একটু কষ্ট হবে—ওই মাতালটার যে হাড় জুড়োবে তা আমি দিব্যি করে বলতে পারি—

বললাম—কোথায় যাবেন—

—কাশীপুরে, আমার এক আত্মীয়ের বাড়ি- অনেক দিন যাইনি -

বাসে উঠলাম দুজনে। বৃষ্টিটা আরো জোরে এলো। পাশাপাশি

দু'জনে বসেছি। পদ্মার সমস্ত শরীরটা আমার শরীরের সঙ্গে ঠেকে রয়েছে। বাসের ঝাঁকনি, বৃষ্টি আর এই পাশাপাশি বসা! হঠাৎ পদ্মা যেন অন্য মানুষ হয়ে গেলো। ছোট মেয়ের চিড়িয়াখানা দেখতে যাওয়ার আনন্দ ওর চোখেমুখে। বাড়িতে অসুস্থ স্বামী আর পাঁচটি ছেলেমেয়েকে রেখে এমন উজ্জ্বল হওয়া বুঝি পদ্মার পক্ষেই স্বাভাবিক। সামনে দিয়ে এক একটা বাস সোঁ সোঁ শব্দ করে চলে যায়। পদ্মা চমকে ওঠে। বলে—বাসে বাসে অনেক সময় ধাক্কা লাগে, জানেন—আজ যদি লাগে বেশ হয়, না—

কাশীপুরে যখন পেঁছুলাম, তখন সন্ধ্যে হচ্ছে। পদ্মা বললে—নামুন এখেনে—নেমে আসুন—

পদ্মাকে পাশে নিয়ে চলতে লাগলাম। পদ্মাই পথ দেখিয়ে নিয়ে চলতে লাগলো। বড় রাস্তার পাশে বাঁ-হাতি একটা ছোট গলির মধ্যে ঢুকেছি। সেই গলি দিয়ে আর একটা গলির ভেতরে এসে পড়লাম। তারপর আর একটা মাঝারি রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে এসে আবার বড় রাস্তায় পড়েছি।

বললাম—আর কতদূরে—

—কাছেই—বলে পদ্মা চলতে লাগলো।

তারপর অনেক ঘুরে ঘুরেও যখন আবার প্রথম গলিটার মুখেই এসে পড়লাম, তখন যেন কেমন একটা সন্দেহ হলো। বললাম ঠিকানাটা মনে আছে তো—

—মনে আছে, কিন্তু আজ আর যাবো না, অন্য দিন বরং আসবোখন—চলুন ফিরে যাই—বলে পদ্মা আবার বাস রাস্তার দিকেই পা বাড়াল।

আবার সেই ফিরতি বাসে ওঠা। কী হলো পদ্মার।

বাসে উঠে একটা কথাও বললে না। মনে হলো- এ আবার কী কৌতুক আমাকে নিয়ে। বাসটা চৌরঙ্গীর কাছে আসছে। হঠাৎ ধর্মতলার মোড়ে আসতেই পদ্মা উঠলো। বললে—নামুন শিগ্গির-

—এখানে কোথায় ?

—কোনও হোটেল নেই আপনার জানাশোনা, যেখানে রাত্রের মত থাকতে পাওয়া যায—জানাশোনা কোনো—কোনো মেয়েকে নিযে কখনও রাত কাটাননি কোনও হোটেলে ?

হঠাৎ এ কী প্রস্তাব! কেমন যেন হতবাক হয়ে গেলাম। ভাবছিলাম কী উত্তর দেব। পদ্মার সংসার—ছোট হলেও তো সংসার। স্বামী সেখানে মদে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকলেও তো স্বামী। একটি নয় পাঁচটি ছেলে-মেয়ের আকর্ষণ! সব কি ভাসিয়ে দিতে চায় নাকি পদ্মা!

—সাহসে কুলোচ্ছে না বুঝি—প্রথমেই তো আপনাকে জিজ্ঞেস করে নিয়েছিলাম সাহসে কুলোবে কি না—

উজ্জ্বল আলোর নিচে দাঁড়িয়ে আমার মুখের ওপর মুখ রেখে প্রশ্ন করছে পদ্মা। পদ্মার মুখের দিকে চেয়ে পদ্মার মনের কথার অর্থোদ্ধার করবার চেষ্টা করলাম। মাথার সামনের কয়েকটা চুলের টুকরো উড়ছে, চোখের ভুরুর ওপর। চৌরঙ্গীর রাত বড় মায়াবী হয়ে উঠলো।

শেষ পর্যন্ত নিয়ে গেলাম একটা হোটেলে। খাবার দিতে বললাম। নিরিবিলি একটা কোণের টেবিলে বসে দুজনে একসঙ্গে খাওয়া। পদ্মার দিকে চেয়ে দেখলাম। পদ্মার দুকূল বেয়ে যেন বর্ষার ঢল নেমেছে। আর বুঝি পদ্মাকে রাখা যাবে না। পদ্মা উপচে পড়বে, ভেসে যাবে, ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

যে ঘরখানায় শোবার বন্দোবস্ত হলো, তার দক্ষিণ দিক খোলা। শোবার খাট একখানা বড়। আরও কত কি দিয়ে সাজানো তা কি তখন দেখবার অবসর আছে। ঘরে ঢুকে পদ্মা চারিদিকের আবহাওয়া দেখে যেন মুগ্ধ হয়ে গেছে। বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল একবার। শহরের বুঝি শ্রেষ্ঠ বাড়িটার সর্বশ্রেষ্ঠ ঘরের বিলাস আজ পদ্মার আয়ত্তে। পদ্মার নিজের শরীরটা নিয়ে গিয়ে বেঁকে দাঁড়ালো ড্রেসিং আয়নার সামনে। নিজেকে দেখছে পদ্মা না দেখাচ্ছে। কে জানে! পদ্মা ক্লান্তিতে যেন আচ্ছন্ন হয়ে এলো। সোফা থেকে উঠে গিয়ে বিছানায় কাত্ হলো একবার। চোখ দুটো বুজে আসছে নাকি। বললে—দরজাটা বন্ধ করে দাও তো—

দুটো হাত মাথার তলায় পেতে চিত হয়ে শুয়ে আছে পদ্মা।

বললে—কাছে এসো তো, অনেক দিন কারো হাঁটুতে মাথা রেখে শুইনি।

মাথার পাশে গিয়ে বসলাম। পদ্মা বললে—আজ যদি বাইরে ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি হোত তো ভালো হোত—না গো—

—কেন—

—বাড়ি যাবার কথা মনে আসতো না—পদ্মা চোখ বুজিয়ে বললে।

—বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে নাকি?

—সব বাড়িই তো বাড়ি নয় জানো, তোমরাই আমার ঘর ভেঙেছো—এখন তোমরাই আমার স্বামীকে দোষ দাও—বলো লোকটা মাতাল—থাকগে

ও-কথা, আজ রাত্তিরটা যদি এখানেই কাটাই তো খারাপ লাগবে না তোমার —অনুতাপ করবে না পরে—

—কেন—

—না, এমনি জিজ্ঞেস করছি, অনেক মেয়ের সঙ্গেই বোধ হয় এখানে—হয়ত এই ঘরেই রাত কাটিয়ে গেছো—এমনি শাড়ি অনেককেই কিনে দিয়েছো—

—তার মানে—

—তার মানে জিজ্ঞেস করো না, উত্তরটা অপ্রিয় লাগবে তোমার, তার চেয়ে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ো—কিন্তু না, কটা বেজেছে বলো তো তোমার ঘড়িতে, আটটা ?

পদ্মা স্থির শান্ত হয়ে এলো এক নিমেষে। বললে—চলো ফিরেই যাই......তোমাকে এমনি একটু পরীক্ষা করছিলাম—

হঠাৎ কথাটা বলেই পদ্মা এক নিমেষে সোজা হয়ে উঠলো। বললে—সেই ভালো, চলো ফিরেই যাই।

তারপর যেন স্বগতোক্তি করতে লাগলো—এখন মোটে রাত আটটা—চলো—আমার স্বামী আমার স্বামীই- আর তুমি তুমিই, তোমরা আমার স্বামীর পায়ের ধুলোর যোগ্যও নও—তোমার বন্ধুর মত পারবে অমন বেপরোয়া হতে—পারবে আমার সঙ্গে এক বিছানায় শুয়ে সমস্ত রাত

তারপর নিজেই গিয়ে দরজার ছিটকিনি খুললে। বললে—চলো—ফিরেই যাই, কিছু মনে করো না, তোমায় শুধু একটু পরীক্ষা করছিলাম

রাস্তায় চৌরঙ্গীর আলোতে নেমে জিজ্ঞেস করলাম—আচ্ছা পদ্মা, এতক্ষণ শুধু পরীক্ষাই করলে তাহলে—আর কিছু নয় ? কিন্তু যদি পরীক্ষাই হয় তো কিসের পরীক্ষা বলতে হবে—

পদ্মা যেন কেমন কৃপাদৃষ্টি দিয়ে আমার দিকে চাইলে। বললে—সে যা'হোক—তুমি পরীক্ষায় পাশও তো হতে পারোনি—বলে সেই রাস্তায় ভিড়ের মধ্যেই হো হো করে হেসে উঠলো। সে হাসির আঘাতে কেমন যেন ম্রিয়মাণ হয়ে গেলাম।

বললাম—কেন ?

- উত্তর শুনতে চাও—কেমন যেন নিষ্ঠুর কঠিন নিষ্প্রাণ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো পদ্মা।

—হ্যাঁ, শুনতে আমাকে হবেই—আমিও দাঁড়িয়ে পড়লাম।

পদ্মা বললে—শুনতে যদি হয়ই তো শোন, আমার দিকে ভালো করে চেয়ে দেখ, আমার এই শাড়ি, সেমিজ, ব্লাউজ হাজার দামী হলেও, হাতে একটা শাঁখাও নেই, গলা আর কানও ফাঁকা, আসল ঘটনা যাই হোক,

লোকে তো আমাকে তোমার স্ত্রী বলেই ভাবছে—তা তোমার পাশে আমার এই নিরাভরণ আমি—এতে তো তোমারই অগৌরব, সারা রাস্তা আমাকে নিয়ে তোমার যে বিড়ম্বনার শেষ নেই—তাও তো লক্ষ্য করছি—অস্বীকার করো না, মিথ্যাচার হবে—

বললাম—এ তোমার ভুল পদ্মা—লোকের কথার মুখ চেয়ে......

—ভুল ? এসো এখনি প্রমাণ করে দিচ্ছি—বলে সোজা আমার হাত ধরে একেবারে চৌরঙ্গীর রাস্তার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালো পদ্মা। দু'পাশে সোঁ সোঁ করে মটর বাস আসছে যাচ্ছে। সন্ত্রস্ত হয়ে পথ পার হতে হয়। সেই চলমান যন্ত্রের ভিড়ের মধ্যে বেপরোয়া পদ্মা আমাকে নিয়ে গিয়ে ঠিক রাস্তার কেন্দ্রস্থলে দাঁড়াল।

বললে—লোকের কথার মুখ চেয়ে নাকি তুমি চলো না, কিন্তু এই চৌরঙ্গীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমাকে চুমু খাওয়ার সাহস তোমার হবে ? প্রমাণ দাও—

তারপর খিলখিল করে হেসে উঠলো। মনে হলো চণ্ডীদাস যেন একলাই মদ খায় না, পদ্মাও আজ অপ্রকৃতিস্থ। ফুটপাথে উঠে এসে বললে—আসলে আমার স্বামীই মানুষ, আর তোমরা লোকলজ্জার ভয়েই মদ খাও না, নইলে ...কিন্তু থাকগে, এখনও সময় আছে, চলো—ওরা হয়ত কান্নাকাটি লাগিয়েছে এতক্ষণ—

মাঝে মাঝে পদ্মার বাড়িতে যাই। চণ্ডীদাস যেন আজকাল ঘন ঘন বাড়ি আসছে, আজকাল দু'বেলার খাওয়াটা সারে বাড়িতেই।

পদ্মা বলে—তুমি খাও আপত্তি নেই—কিন্তু বাড়িতে বসে খাও—

চণ্ডীদাস বাড়িতে বসেই খায়। পদ্মা দোকান থেকে আনিয়ে দেয় মদ। খেতে খেতে এক সময় জ্ঞান হারায়। তখন আবার ধরে বিছানায় উঠিয়ে দেবার পালা। দুপুরবেলা চণ্ডীদাস যখন অঘোরে নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়, ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়িয়ে পদ্মা আমার পাশে বসে গল্প করে।

পদ্মা বলছিলো—আপনার বন্ধু কাল সকালে কী বলছিলো জানেন, বলছিলো আপনাকে একদিন নেমন্তন্ন করে খাওয়াতে—

—আমাকে ? কেন ?

—মাতাল হলেও বুঝতে পেরেছে বোধ হয় আপনার টাকাতেই সংসার চলছে,—ছেলেমেয়েদের গায়ে জামা উঠেছে, আমার গায়ে ব্লাউজ। কয়েক

দিন মাংসও তো খাইয়েছি—ঠিক সময়ে খাওয়া, ঠিক সময়ে নাওয়া—পল্টু ইস্কুলে ভর্তি হলো—বাড়িওয়ালার বাকী ভাড়া শোধ হয়ে গেছে—তাই বোধ হয় আপনাকে একদিন নেমন্তন্ন করে খাইয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চায়—

পদ্মা তারপর হাসতে হাসতে বললে—অবস্থা যে এ বাড়ির ভালো হয়েছে তা যেন কাক-পক্ষীতেও জানতে পেরেছে—আগে এ-বাড়িতে উঠোনে কাকের উপদ্রব ছিলো না, তা ছাড়া জানেন, আশেপাশের বাড়ির থেকে আজকাল কেউ সরষের তেল, কেউ নুন, কেউ মশলা ধার চাইতে আসে—

বললাম—সে যাকগে—চলো আজকে সিনেমায় যাই—

—সিনেমায়? হঠাৎ? পদ্মা দেয়ালে হেলান দিয়ে আমার দিকে চাইলে।

বললাম—এই টিকিট দুটো কিনে এনেছিলাম—ইচ্ছে হলে যেতে পারো—আর না হয় তো থাক—নষ্ট হবে, এই যা—

—তা দুখানা কিনে আনলেন কেন? ছেলেমেয়েদের সকলকে নিয়েই একদিন যাই চলুন না—আপনার বন্ধুকেও না হয় সঙ্গে নেওয়া যাবে...আর একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, জানেন, কালকে আপনার বন্ধুকে খাইয়ে-দাইয়ে অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম .....

অবাক হলাম একটু। বললাম—তাই নাকি? তারপর?

—অফিসে গেল ও। একটা কৌটোতে করে পরোটা আর বেগুনভাজাও দিলাম দুপুরবেলার জন্যে, সমস্ত দিন আমার কী অশান্তিতেই যে কেটেছে কী বলবো—সমস্ত দিন মা কালীকে ডাকলাম, আগের রাত থেকে উপোস করেছিলাম, মানত করেছিলাম, যদি অফিস থেকে ভালোয় ভালোয় ফেরেন তো মায়ের প্রসাদ খেয়ে ভাত খাবো—

কথা বলতে বলতে পদ্মা হঠাৎ উঠলো—কটা বাজে আপনার ঘড়িতে দেখুন তো- চারটে? একটু বসুন, উনুনে আগুনটা দিয়ে নি, আপনার চা করে দি—তারপর ওরা সবাই ইস্কুল থেকে অফিস থেকে ফিরবে—একটু জলখাবার করি, আপনি পিঁড়িটা রান্নাঘরের সামনে সরিয়ে আনুন—জলখাবার করতে করতে আপনার সঙ্গে গল্প করবো—

পদ্মার নৈপুণ্য দেখলে কিন্তু অবাক হতে হয়। একহাতে কত সহজে কত তাড়াতাড়ি যে সংসারের সব কাজ সারে। কড়ায় লুচি ভাজতে ভাজতে বললে—আমার বাবাও ছিলেন মাতাল—মার সারাজীবনে কী কষ্টটাই না গেছে তা আমি জানি ..সেই থেকেই মাতালদের ওপর আমার ভারি ঘেন্না—মনে মনে প্রার্থনা করি, ভগবান মাতাল স্বামী যেন কারো না হয় এ সংসারে—

লুচি তরকারী হবার পর চা তৈরী করে নিলে পদ্মা।

দু'কাপ চা হাতে নিয়ে গিয়ে রান্নাঘরে শেকল দিয়ে বললে—চলুন, ঘরে বসে চা খাব—চেয়ার টেবিল কিনে দিয়েছেন ছেলেমেয়েদের পড়ার জন্যে, আর আপনিই একদিন বসলেন না চেয়ারে—

শোবার ঘরে গিয়ে বসলাম। চেয়ারে বসে মুখোমুখি দু'জনে চা খাচ্ছি।

পদ্মা বললে—কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করছেন না ঘরে?

বললাম—কই, কিসের পরিবর্তন—

চারিদিকে চাইতে লাগলাম। কিছুই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নজরে পড়লো না। একজোড়া তক্তাপোশ তারই ওপর বিছানা পাতা। ও তক্তাপোশ তো আমিই কিনে দিয়েছিলাম।

পদ্মার দিকে চাইতে দেখি পদ্মা হাসছে। হাসিটা খুব নতুন রকমের লাগলো। স্নিগ্ধ লজ্জা মেশানো হাসি। হাসি থামিয়ে বিছানার দিকে আঙুল দিয়ে দেখালে পদ্মা।

পদ্মা হাসতে হাসতে বললে—আপনার বন্ধুর কাণ্ড দেখুন না...ক'দিন থেকে কেবল কী খেয়াল যে হয়েছে, আমায় ওর পাশে শুতে হবে......ছেলে-মেয়েদের বিছানা পাশে সরিয়ে দিয়েছে।......দেখুন সারা রাত গরমে হাত পা ছড়িয়ে শুতে পারবো না, একজন ধুমসো মানুষের পাশে গরমে কষ্ট হয় না আমার......বলুন—আপনার বন্ধুর যত বয়েস বাড়ছে তত ছেলে-মানুষীও যেন......

কথাটা বলে হাসতে গিয়ে চায়ের কাপ থেকে চলকে শাড়ির ওপর চা পড়ে গেলো।

—আর একটা কথা শুনেছেন—ইতিমধ্যেই পাড়ায় বেশ কানাঘুষো শুরু হয়ে গেছে আপনাকে নিয়ে—পদ্মা আমার দিকে চাইলে।

বললাম—কী রকম?

—আপনার বন্ধুকে বলছিলাম সেদিন, উনি বললেন—পাড়ার লোকের কানাঘুষোর কোনও দাম নেই, আরো বললেন—লোকের কথায় কান দিও না পদ্মা—

জিজ্ঞেস করলাম—উত্তরে তুমি কী বললে?

—কিছুই বললাম না, আজো এ কথা তুললাম না আপনার কাছে, কিন্তু সেদিনকার কথা মনে আছে আপনার—চৌরঙ্গীতে আমাকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন, আমার কানে গলায় হাতে একটা গয়নাও ছিলো না, পাছে লোকে আমাকে আপনার স্ত্রী ভেবে আপনার আর্থিক অবস্থার সম্বন্ধে ভুল ধারণা করে এই ভেবে আপনার অস্বস্তির সীমা ছিলো না—মনে আছে?

আর কথা জমলো না। অফিস থেকে চণ্ডীদাসের আসার সময় হয়ে এলো। চলে এলাম।

নানান কারণে কয়েকদিন যাওয়া হয়নি চণ্ডীদাসের বাড়ি। কলকাতার বাইরে যেতে হয়েছিলো কিছুদিনের জন্যে। সেদিন সকাল বেলাই কলকাতায় ফিরেছি। ভোর বেলা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম।

পেছন ফিরতেই দেখি পদ্মা। আমার দিকে চেয়ে চেয়ে হাসছে। কী একটা উপলক্ষ্যে একটা লালপাড় শাড়ি দিয়েছিলাম পদ্মাকে, সেইটেই পরনে। মাথায় ভিজে চুল এলো করা। ডান হাতে একটা পেতলের ঘটিতে গঙ্গাজল উপচে পড়ছে। আর দুই হাত ভর্তি কাচের চুড়ি আর শাঁখা। নতুন করে এখনি পরা মনে হলো যেন। শাঁখার গায়ে এখনও টাটকা সিঁদুর লেগে আছে। আর শাড়িব লালপাড়ের পাশে সিঁথির ওপব চওড়া সিঁদুর আরো প্রখর, আরো প্রত্যক্ষ, আরো তীক্ষ্ম। যেন চোখ ঠিকরিয়ে দেয়—

বললাম—কোথায় গিয়েছিলে এদিকে?

—মায়ের মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলাম, কিন্তু আপনি আব অনেক দিন আসেননি যে—আপনার বন্ধু খোঁজ করছিলো ক'দিন—

—আর তুমি? পদ্মার মুখের দিকে চেয়ে হাসতে লাগলাম।

পদ্মাও হাসলো। বললে—আপনার বন্ধু আর আমি দু'জনে কি আলাদা নাকি—

তা বটে, আলাদা কেন হতে যাবে, আমারই ভুল, বাড়ির সব খবর ভালো......ছেলেমেয়েরা......

—রাস্তায় দাঁড়িয়ে কিছু বলবো না। আপনাকে যেতে হবে, কবে যাবেন বলুন—

—তুমি বলো কখন যাবো—

—আজই—

কিন্তু সন্ধ্যেবেলাও ঠিক যেতে পারলাম না পদ্মার বাড়ি। কাজের তাগিদে এমন আটকে পড়লাম যে কিছুতেই রাত সাড়ে ন'টার আগে সেখান থেকে উঠতে পারলাম না। পদ্মার বাড়িতে যখন এসে পেঁৗছেছি তখন দশটা বেজে গেছে আমার ঘড়িতে।

আকাশে মেঘ ছিলোই, আমি পেঁৗছুবার সঙ্গে সঙ্গেই বৃষ্টি নামলো।

দরজা খুলে দিলে পদ্মা। বললে—এত রাত্তিরে—

কানে যেন কেমন খটকা লাগলো। কই, এমন সময়ে কিম্বা এর পরেও তো কতদিন এসেছি, কোনওদিন পদ্মা তো এমন সুরে এমন প্রশ্ন করেনি। পদ্মার মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম। রান্না খাওয়া, খাওয়ানো, বাসন মাজা সবই হয়ে গেছে। সবাই শুতে গেছে। পদ্মাও কি তবে বিছানায় শুয়ে পড়েছিলো? পান খেয়ে রাঙা করেছে মুখ। হয়ত আমার ডাকেই চণ্ডীদাসের পাশ ছেড়ে উঠে আসতে হয়েছে।

ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছে। বারান্দার তলায় গিয়ে দাঁড়ালাম। আজকালকার বৃষ্টি একবার আসে আবার খানিক পরেই শুকনো।

পদ্মারা কি আজকাল সকাল সকাল সংসারের কাজ সেরে শুয়ে পড়ে! তবে বুঝি এখন সংসারে সুখ এসেছে। সময়নিষ্ঠা এসেছে। আজকাল সব রাতেই তো চণ্ডীদাস বাড়ি থাকে চণ্ডীদাসের পাশে শোওয়ার ঐশ্বর্যে পদ্মা কি ভারি হচ্ছে দিন দিন। কেমন যেন মোটা দেখাচ্ছে ওকে এখন—এই রাত দশটার সময়।

পদ্মা আবার বললে—এত রাত্তিরে যে—হঠাৎ—

- তুমিই তো আসতে বলেছিলে আজ- কাজের জন্যে একটু দেরি হয়ে গেলো তুমি কি শুয়ে পড়েছিলে?

না, শুয়ে পড়বো কেন, সকাল পাঁচটার সময় উঠে যাকে ইস্কুল-অফিসের ভাত দিতে হবে তাকে এই রাত বারোটা পর্যন্ত জেগে থাকতে হবে বৈকি? রাত ক'টা হলো খেয়াল আছে -

—দশটা পনেরো—ঘড়ি দেখে বললাম।

পদ্মা যেন ছিটকে উঠলো। বললে--আপনার ঘড়িটা আপনারই মতন—কখনও ঠিক পথে চলবে না -

-তার মানে-

- তার মানে বলবো? তার মানে কোনও ভদ্রলোক কোনও ভদ্রলোকের বাড়িতে এত রাত্রে আসে? আপনার ঘড়ি দেখে কতবার ঠকেছি—পরিচয় তো আমাদের আজকের নয়—

—আমার সঙ্গে পরিচয় হওয়াতে কেবল ঠকেছই বৈকি পদ্মা—

--না, ঠকিনি তো শুধু উপকারই পেয়েছি বলতে চান......বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন একদিন, তারপর এখানে কীসের আকর্ষণে সেদিন মনিব্যাগটা ফেলে গিয়েছিলেন শুনি, কিসের আকর্ষণে শাড়ি, জামা কিনে দিয়েছিলেন বন্ধুর স্ত্রীকে কিসের আকর্ষণে মাসের পর মাস বন্ধুর সংসার চালিয়ে এসেছিলেন শুনি—শুধু বন্ধুর উপকার—না তার সর্বনাশ, কোন্‌টা চেয়েছিলেন? কথা বলছেন না কেন,—বলুন কথা—উত্তর দিন—

স্তম্ভিত হয়ে পদ্মার কথাগুলো শুনতে লাগলাম। পদ্মা হাঁফাতে লাগলো।

পদ্মা বলতে লাগলো আবার—এত বড় স্পর্ধা আপনার, আপনি কি না আজ উপকারের খোঁটা দিলেন, এ-সংসারের পেছনে যেন অকারণে টাকা ব্যয় করেছেন, যেন প্রতিদানে কিছুই পাননি, তবু বড় গলা করে বলছেন আমি ঠকিনি—আপনি মিথ্যাবাদী—আপনার মুখ দেখলে পাপ হয়—আপনি বেরিয়ে যান আমার বাড়ি থেকে, বেরিয়ে যান—

এ আবার পদ্মার কী রূপ। ঝম ঝম করে বৃষ্টি হচ্ছে। তবু পদ্মার প্রখর চীৎকার যেন আশে পাশে সকলের কানে পেঁাছেছে। দু'চারটে বাড়ির দোতলার জানালা খুলে গেলো। চণ্ডীদাস হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়ে উঠে এসে হাজির। বললে—কী ব্যাপার ভাই—কী হলো পদ্মা—

পদ্মা হঠাৎ চণ্ডীদাসকে দেখে হাউহাউ করে কেঁদে উঠলো। কাঁদতে কাঁদতে বললে—তুমি যদি মানুষ হতে তো আমার ভাবনা, তোমার বাড়িতে এসে তোমার স্ত্রীকে বাইরের লোক অপমান করে যায়—এতেও তোমার চৈতন্য হয় না—এমন স্বামীও হয় মানুষের......বলতে বলতে কথা আর শেষ করতে পারলে না পদ্মা। নিজের আঁচলে মুখ ঢেকে অঝোরে কাঁদতে লাগলো।

বৃষ্টি থেমে আসছিল। বললাম—আসি চণ্ডীদাস—

—চণ্ডীদাস যেন কেমন বিব্রত বোধ করলে, বললে—বৃষ্টি থামুক না, এত তাড়াতাড়ি কিসের?

আপত্তি না শুনে অন্ধকার গলিতে পা বাড়ালাম। চণ্ডীদাসও কোঁচার খুঁট্‌টা গায়ে জড়িয়ে সঙ্গে সঙ্গে আসতে লাগলো। বললে—তুমি কিছু মনে করলে নাকি, তুমি তো জানো পদ্মা ওই রকম—কখন কাকে কী কথা বলতে হয় জানে না—সম্প্রতি মেজাজটা আরো খিটখিটে হয়ে গিয়েছে.. ..

আমি চুপচাপ চলতে লাগলাম।

—আর তা ছাড়া—চণ্ডীদাস বলতে আরম্ভ করলে—তা ছাড়া ক'মাস ধরেই ওর শরীরটা খারাপ যাচ্ছে কিনা। তুমি জানো না তো—কাল সকালে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলাম ওকে, সাতমাস কিনা এখন, তাই খিটখিটে হয়ে গেছে আরো... ..আর বলো কেন ভাই খরচের ওপর খরচান্ত......তবে এই শেষ .....এই নাককান মোলা দিলাম—

দাঁত বার করে হাসতে লাগলো চণ্ডীদাস। যেন ভারি রসিকতার বিষয় একটা।

চণ্ডীদাস আরও কী সব বলতে লাগলো, সব কথা শেষ হবার আগেই বড় রাস্তায় পা বাড়ালাম।

আমীর ও উর্বশী

জীবনরাম কুণ্ডু এণ্ড কোং-এর জীবনরাম বললেন,—কিছু খেয়ে নিলে হোত না হরিপদ?

হরিপদ তৈরীই ছিলো। বললে—এই রোখকে, রোখকে—

ফিটন গাড়িটা থেমে গেলো।

—তাহলে এই দোকানেই ঢোকা যাক—কী বলেন, বেশ নিরিবিলি আর মাংসটা আপনার গিয়ে খুব ভালো করে এরা—

হরিপদ সম্মতির অপেক্ষা করতে লাগলো।

তা জীবনরামের আপত্তি নেই। হরিপদ যখন বলছে, তখন আর তাঁর আপত্তি করবার কী আছে। কলকাতা শহর সম্বন্ধে হরিপদর চেয়ে কে আর বেশী জানে? এখানে এই শহরে হরিপদই তো জীবনরামের ভরসা। হরিপদর হাতেই জীবনরাম নিজের ভাল-মন্দের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত।

—নেমে আসুন স্যার—হরিপদ গাড়ির দরজাটা খুলে দিয়ে দাঁড়ালো।

—দেখবেন স্যার, খুব সাবধান—

জীবনরামকে একরকম হাত ধরেই নামিয়ে নিলে হরিপদ।

জীবনরাম বললেন—ওগুলো নিলে না?

—কিছু ভাববেন না স্যার, আমি যতক্ষণ আছি, আপনি কিচ্ছু ভাববেন না—বলে হরিপদ গাড়ির ভেতর থেকে গোটা তিন-চার বোতল জামার পকেটে আর বগলে তুলে নিলে। বললে, আসুন স্যার, আমার পেছনে পেছনে আসুন—

নিরিবিলি একটা ঘেরা ঘরের মধ্যে ঢুকে হরিপদ বললে—বসুন এখানে আরাম করে আপনি—

তারপর বাইরে গিয়ে একজন 'বয়'কে সঙ্গে নিয়ে এসে বললে—সেলাম কর বাবুকে—সেলাম কর বেটা—কোটিপতি বাবু, বুঝলি, চক্ষু সার্থক করে নে—তোদের এই দোকানের মত দশটা দোকান কিনে নিতে পারেন—আজ বেটা তোর ভাগ্যি ভালো, মোটা বকশিশ পাবি—সেলাম কর, সেলাম কর ব্যাটা—

জীবনরাম বিব্রত বোধ করলেন, বললেন—থাক হরিপদ, থাক—

—না, থাকবে কেন মশাই, করলেই বা সেলাম, পুণ্যি হবে ব্যাটার, কটা কোটিপতি দেখেছে মশাই ও! সত্যি কথাই বলবো মশাই, আমিই বা কটা

দেখেছি? এ আমার বাপের ভাগ্যি যে, আপনার সঙ্গে এক টেবিলে বসে খাই—নইলে আমরা কি আপনার পায়ের ধুলোরই যুগ্যি?

জীবনরাম প্রশান্ত মুখে হাসতে হাসতে বললেন—কী যে তুমি বল হরিপদ—

হরিপদ জীবনরামকে বললে—না, খুব বিশ্বাসী লোক—বুঝলেন, আমি এখানে যখনি আসি, এর হাতে ছাড়া খাইনে. ....এখন কী খাবেন বলুন তো. ....এখানে আপনার সব পাওয়া যাবে—

জীবনরাম কিছু বলতে যাচ্ছিলেন......

তার আগেই হরিপদ বললে—তুই-ই একটু বুদ্ধি খরচ করে নিয়ে আয় দিকিন—বেশ ঝাল-ঝাল মিঠে-মিঠে—যা খেলে শরীরটা চাঙা হয়ে ওঠে...কী বলেন স্যার—

হরিপদ দেখলে, জীবনরাম যেন উসখুস করছেন। পাখাটা জোরে ঘুরছে ...মিহি আদ্দির পাঞ্জাবীর হাতা দু'টো আরো মিহি গিলে করা। মিনে করা হীরের বোতাম চারটে ঝিকমিক করছে—আর গলার বোতামটা খোলা, তারই উল্টো পিঠে বেগুনি মিনেতে লেখা 'জে, কে' অর্থাৎ ডিমুচেরালির সুবিখ্যাত চাউল ব্যবসায়ী 'জীবনরাম কুণ্ডু এণ্ড কোং'এব মালিক জীবনরাম কুণ্ডু। খাঁটি কালো গায়ের রং। হরিপদব উপরোধে আজ মুখে স্নো আর পাউডার মেখেছেন।

হরিপদ বললে— আর একটু ঢালবো নাকি স্যাব? এখনি ঝিমিয়ে গেলে চলবে কেন?

জীবনরাম বললেন—শেষকালে ডোজ বেশী হয়ে যাবে না তো হরিপদ?

—বলেন কি স্যার, আমি যতক্ষণ আছি, আপনি কিচ্ছু ভাববেন না, চলুন না, এই যাবার মুখে মাথুরামের বেনারসী পানের দোকানে মৃগনাভি দেওয়া খিলি খাইয়ে দেব, দেখবেন শরীর একেবারে চাঙা হয়ে উঠেছে, ঠিক পঁচিশ বছরের ছোকরার মতন—আপনার আর ভয় কিসের—

তা বটে। আজ সকাল থেকেই জীবনরাম যেন নতুন মানুষ হয়ে উঠেছেন। বহু অভাব দুঃখ কষ্ট গেছে জীবনরামের জীবনে। ঢাকায় খবরের কাগজ ফেরি করতে হয়েছে—স্টেশনের প্লাটফরমে কত রাত কাটাতে হয়েছে। কত বিনিদ্র রাত কেটেছে জীবনরামের উপোস করে। তখন অবশ্য আগুন লাগেনি ভাতের—কিন্তু দেশের সেই সুদিনেও তার কতদিন ভাত জোটেনি। কিন্তু একনিষ্ঠা আব অধ্যবসায়, ওরই জোরে 'জীবনরাম কুণ্ডু এণ্ড ক্যোং'-এর একদিন প্রতিষ্ঠা হলো।

হরিপদ গ্লাসটা এগিয়ে ধরলে। বললে—বেশ করে সোডা দিয়ে দিয়েছি. চোঁ চোঁ করে ঢালুন তো গলায়—ঢেলেই সিগ্রেটে টান দিন. ওই সিগ্রেটটা

টানতে যেন দেরি করবেন না স্যার, তাহলেই সব ফর্তি একেবারে মাটি।

জীবনরাম বললেন—দেরি হয়ে যাচ্ছে না তো হরিপদ?

—আজ্ঞে, দেরি কোথায়, হরিপদর ঠিক হিসেব আছে, আটটার সময় খাবার কথা, এখন বেজেছে ছটা—দু ঘণ্টা এখন মেজে-ঘষে শরীরটাকে চনচনে করে তুলুন না,—

হরিপদ জীবনরামের দিকে চোখ টিপে একটা অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করলে।

সরু দেরাদুন চালের ভাত আর ফাউলকারি।

জীবনরাম মুরগীর ঠ্যাংটা নিয়ে আর সামলাতে পারছেন না। ঝোলে-ঝালে জীবনরামের হাত আর মুখ একাকার হয়ে গেছে। হরিপদ দেখতে লাগলো। দেখতে লাগলো আর ভাবতে লাগলো। তেরশ পঞ্চাশের শ্রাবণ মাস সেটা—ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি...সারা গাঁয়ে এককণা চাল নেই কারু কাছে। আগের বোশেখে মেজো ছেলেটা মারা গেছে পেটে ঘা হয়ে, তারপর পড়ল ছোট মেয়েটা জ্বরে। জ্বর থেকে উঠে পথ্য করবার চাল নেই। জীবনরাম বললেন—একটু বেশী রাত করে এস হরিপদ—দেব তোমাকে।

রাত করেই হরিপদ গেলো। দরজার বাইরে টোকা দিতেই কয়াল এসে দরজা খুললে।

জীবনরাম অত রাত পর্যন্ত টাকা পয়সার হিসেব নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। হরিপদকে দেখে বললেন—মুকুন্দ, ধুচুনীতে ভাল চাল একপো রাখা আছে, দাও তো এনে হরিপদকে—সস্তা দরেই তোমাকে দিলাম হরিপদ, তিরিশ টাকার দরে তুমি চাল পাবে না এ তল্লাটে।

হরিপদ বলেছিল—একপো চালে আমার কী হবে, অন্তত সের দশেক—

জীবনরাম হেসে উঠেছিলেন হো হো করে—নিজের খাবার চাল থেকে দিলাম কিনা, ছোট মেয়ে পথ্য করবে বললে—বলে, সোনা চাইলে সোনা দিতে পারি, চাল কোথায়?

কিন্তু কতদিন স্টেশনে যাবার পথে ডিমুচেরালির ঘাটে গিয়ে দেখেছে হরিপদ—'জীবনরাম কুণ্ডু এণ্ড কোং'-এর গুদাম থেকে দুর্মনি বস্তা পাচার হচ্ছে বজরা নৌকোয়। নৌকো ভর্তি হয়ে সে চাল কোথায় যেতো কে জানে। রাত দুটো তিনটে পর্যন্ত লম্প জেলে কাজ হতো। চাটগাঁ, কলকাতা, দিনাজপুর না যশোর কে জানে। 'জীবনরাম কুণ্ডু এণ্ড কোং'-এর নতুন গুদাম তৈরী হলো—পনেরখানা বজরা তৈরী হলো—আর গাঁয়ের লোক উচ্ছন্ন হয়ে গেলো না খেতে পেয়ে। সেসব তেরশ পঞ্চাশ সনের কথা। কতদিন হয়ে গেলো, তারপরে জীবনরাম কুণ্ডুর কলকাতায় চারখানা বাড়ি—দেশে চারটে গ্রামের পত্তনি—অনেক কাণ্ড ঘটে গেছে।

জীবনরাম বললেন—দেরাদুন রাইস দিয়েছে হে হরিপদ—আহা, বেশ

গন্ধ, এই চাল, এর জন্যে কী কাণ্ডটাই না হয়েছে, কী বল হরিপদ—

হরিপদ বললে—তা যা বলেছেন স্যার, মরেছে যতো হতভাগারা, পাপ করেছিলো আর জন্মে, তার ফলভোগ করলে—তা মা লক্ষ্মীর কৃপায় আপনার তো চালের অভাব হয়নি—

জীবনরাম মুরগীর হাড় চুষতে চুষতে বললেন—আমি আর কী করেছি হরিপদ, দেখগে যাও নাড়াজোলের রায়েদের—মনে করলাম আর দর বাড়বে না, ষাট টাকার দরে ছেড়ে দিলাম, নইলে সে দুশো বস্তায় আমার বেকসুর দু লক্ষ টাকা আসতো—দর যখন বাড়লো, তখন নাড়াজোলের রায়েরা ধুলো-মুঠোকে সোনা মুঠো করেছে আর আমি বুড়ো আঙুল চুষেছি—এখন ভাবি আর কপাল চাপড়াতে ইচ্ছে করে......

ভাত আর ফাউলকারির শেষে এল চিকেন রোস্ট।

হরিপদ বললে—এইটে খুব চুষে চুষে খান স্যার; এটা খেলে একেবারে খাঁটি রক্ত করে ছেড়ে দেবে, খাওয়ার পর মৃগনাভি দেওয়া এক খিলি পান খাইয়ে দেব, দেখবেন শরীরটা কেমন চাঙা হয়ে ওঠে।

জীবনরাম বললেন—সেদিন সন্ধ্যায় পানটা খেয়ে খুব ভাল ফল দিয়েছিলো হরিপদ..... .

হরিপদ বললে—আজ্ঞে ওটা পানেব গুণ নয়, যা আপনাকে দেখিয়ে দিয়েছি ও আপনার গিয়ে কোটিতে একটা পাবেন কি না সন্দেহ, এই রাত্রে যাচ্ছেন তো, গেলেই টের পাবেন।

জীবনরাম যেন বিগলিত হয়ে গেছেন, বললেন—চোখ দুটো ওর ভারি মন-মাতানো কিন্তু হরিপদ।

হরিপদ বললে—কোন্‌টা মন-মাতানো নয়—বলুন তো স্যার,—আপনি তো সকালে দু'ঘণ্টা কথা বললেন, চুলটা কেমন বলুন দিকি, ঠোঁট দুটো, গাল, নাক, আর গায়ের রং—ইহুদী মেয়েকে হার মানিয়ে দেবে, মশাই।

জীবনরাম বললেন—বাড়িতে কে কে আছে ওদের?

—ওই তো বুড়ো মা, বড় ভাই আর ছোট একটা বোন, বড় ভাইটা কি মানুষ, মানুষ নয় স্যার, কোনও দিন বাড়ি আসে, কোনও দিন আসে না, এদের চলে কি করে বলুন তো, ওই মেয়েটা কলেজে পড়ে, কিন্তু পয়সা নেই—আমি ভিক্ষে-টিক্ষে করে টাকার যোগাড় করে দেই, তাই চলে—আমাকেই ও বাড়ির একরকম অভিভাবক বলতে পারেন।

জীবনরাম বললেন—বাড়িটা বড় ঘুপসির মধ্যে হরিপদ, পাড়াটাও ভালো নয়।

হরিপদ বললে—ওই বাড়িরই ভাড়া আজ্ঞে পঞ্চাশ টাকা, আপনার যদি কৃপা হয়, তবে বাড়ি আর বদলাতে কতক্ষণ? কলেজের মাইনে দু'মাসের বাকি

পড়েছে, ছোট বোনটার অসুখ, ডাক্তারের খরচ দিতে পারে না—বড় ভাইটা কেবল রেস আর ফ্লাশ খেলে বেড়ায়; আজকালকার বাজারে বাড়িভাড়া দিয়ে কলকাতা শহরে থাকতে কতো খরচ আপনি বলুন তো—

জীবনরাম বললেন—সকাল বেলা দু'জন মটরে করে কারা এসেছিলো, হরিপদ? ওই যে খুব বিরাট একটা গাড়ি—দুজন ভদ্রলোক—খুব বড়লোক বোধ হয়—হাতে ফুলের তোড়া।

ঠোঁট দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ করে হরিপদ বললে—আরে রাম, বড়লোক না হাতী, আপনার পায়ের যুগ্যি নয় ওরা স্যার, আপনাকে চিনতে পারলে ভয়েই পালিয়ে যেত, আমি তো দেখতে লাগলুম ওদের কাণ্ড—ফুল নিয়ে দিলে, এই সবই করছে, চকোলেট আনে, গয়না আনে, শাড়ি দেয়—কত কি জিনিস কিনে দেয়...ওরা সব দালাল স্যার...দালাল লেগেছে পেছনে, বুঝেছে যে, বাড়িতে কোনও পুরুষমানুষ নেই—

জীবনরাম বুঝতে পারলেন না।

—দালাল? কিসের দালাল হরিপদ?

—আজ্ঞে, সিনেমা কোম্পানীর, রেকর্ড কোম্পানীর দালাল সব। হাজার টাকা মাইনে দিতে চায়, বলে—গাড়ি করে বাড়ি থেকে নিয়ে যাবো, দিয়ে যাবো —যেখানে যাবে, মা সঙ্গে থাকবে, বিকেল ছ'টার পর ছুটি দেবো, কত লোভ দেখায়, আহা, ছোট মেয়ে তো, কতই বা বয়েস, এই শ্রাবণে আঠারোয় পড়েছে, লোভও হয়—একদিন হয়েছে কি জানেন—এক বায়োস্কোপ কোম্পানীর যে খোদ মালিক, সেই এসেছে গাড়ি করে, এসে বলে—অনীতা আমার মেয়ের মত, ওর ভাল-মন্দ আমারও ভাল-মন্দ—বলে মাকে তো রাজী করিয়েছে—

জীবনরাম যেন নিজের ব্যবসার একটা লোকসানের সংবাদ শুনে ভীষণ বিচলিত হয়ে উঠেছেন। বললেন—বল কি হরিপদ, রাজী করিয়েছে...সর্বনাশ করেছে, খবরদার, খবরদার, ভদ্রলোকের—গেরস্থ ঘরের মেয়ে—শেষকালে কি বায়োস্কোপে নাচবে নাকি, ছি ছি, তুমি থাকতে হরিপদ, ভদ্রলোকের মেয়ের এই গতি হবে—আর আমরা চোখ মেলে দেখবো—

হরিপদ বললে—ওতো তবু ভালো মশাই, আর একদিন হয়েছিলো কি জানেন না, ওদের কলেজের একটা চ্যারিটি শো-তে নাচতে গেছে, নাচ হচ্ছে স্টেজে, সোনাগড়ের কুমারবাহাদুর নাচ দেখে একেবারে পাগল—একেবারে পাগল মশাই। কী চেহারা! রাজার ছেলে, হবে না কেন—যেমন রং, তেমন গড়ন আর তেমনি মুখের কথা—একটা সোনার মেডেল দিলে অনীতাকে, তারপর গাড়ি করে পৌঁছে দিলে।

জীবনরাম বললেন—বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেলো!

—তবে আর মজাটা হোল কি, শুনুন না বলি—ড্রাইভারকে দিয়ে খাবার

কিনে আনালে, তারপর সবাই মিলে খাওয়া হলো, তার পরদিন এলো—আবার তারপর দিন এলো, এই রকম রোজ আসে। রাজার ছেলে, এরাও কিছু বলতে পারে না, শেষে একদিন দারোয়ান দিয়ে চুপি চুপি অনীতার নামে একটা পাঁচশো টাকার চেক পাঠিয়ে দিয়েছে......

জীবনরাম এবার সত্যিই বিরক্ত হয়ে উঠলেন। বললেন—বলা নেই, কওয়া নেই,—একেবারে পাঁচশো টাকার চেক? খুব বড়লোক নাকি?

—আরে রাম, ওকে বলেন আপনি বড়লোক, স্টেট তো উল্টে যেতো, কোর্ট-অব-ওয়ার্ডে চলে গেছে। এখন রিসিভারের কাছ থেকে এক এক ছেলে মাসোহারা পায় দু হাজার করে—কিন্তু চরিত্রহীন যারা, তাদের আপনার দু'হাজার টাকায় কি হবে বলুন স্যার?

জীবনরাম উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন।

—তারপর সেই পাঁচশো টাকার চেকটা?

—আজ্ঞে, চেকটা তো অনীতা নিলে, কিন্তু আমাকে না জানিয়ে তো কিছু করবে না, আমার ভারি রাগ হয়ে গেল স্যার, আমি ওর মাকে বললুম—এসব কী কাণ্ড! গেরস্থ ঘরের মেয়ের নামে একেবারে টাকা পাঠানো, এ তো ভালো কথা নয়, এরপর কত কী হবে, হ্যাঁ বুঝতাম, দিতো এসে নিজে মার হাতে তুলে—যে তোমাদের অভাব—আমি কিছু সাহায্য করছি.. ইত্যাদি, সে এক আলাদা জিনিস।

জীবনরাম বললেন—এসব লোকদের বাড়িতে ঢুকতে দেওয়াই অন্যায় হয়েছে হরিপদ।

—না, এই যে সকালে আপনি আমাকে হাজার টাকা দিয়েছেন, আপনি তো অনীতার হাতেই দিতে পারতেন সকালে। তা না দিয়ে আমাকে দিলেন কেন? আমি সেই টাকা নিয়ে সোজা অনীতার মাকে গিয়ে দিলাম—বললাম ভগবান কুণ্ডুবাবুকে যেমন টাকা উপায় করবার মাথা দিয়েছেন, তেমনি দান করবার হৃদয়টুকুও দিয়েছেন—দুর্ভিক্ষের সময় পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করে খিচুড়িখানা করেছিলেন, পরের জন্যে আপনি ফতুর—সত্যি কথাই সব বললাম স্যার, বললাম—নাও, এই হাজার টাকাতে যতদিন চলে চালাও—তারপর কুণ্ডুবাবুর কাছে হাত পেতে কখনও কেউ হতাশ হয়নি।

জীবনরাম বললেন—আরো যদি টাকার দরকার থাকে তো আমাকে বলো হরিপদ।

—তা ওদের সঙ্গে তোমার আলাপ হলো কেমন করে?

—সে এক ইতিহাস স্যার, বেনেটোলা লেনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি—হঠাৎ দেখি, একটা চলন্ত ঘোড়ার গাড়ি থেকে একটা মেয়ে লাফিয়ে পড়লো, লাফিয়েই আমাকে দেখে আমার দিকে এসে আমাকে একেবারে জড়িয়ে

ধরলো। অমন সুন্দর চেহারা, ভাবলুম—এ কিরে বাবা! চেয়ে দেখি, গাড়ি থেকে আরো দু'জন লোক নেমে পড়লো ওর পেছন পেছন। কিন্তু আমাকে দেখে আর কাছে এগুলো না। আমি বললাম—কী হয়েছে? মেয়েটা বললে—একলা বেরিয়েছিলো, ওরা পেছন নিয়েছিলো। তারপর নিরিবিলি দেখে এক সময়ে এক গলির মধ্যে জোর করে ওই গাড়িতে তুলে নিয়ে আসছিলো, এইখানে সুযোগ পেয়ে মেয়েটা লাফিয়ে নেমে পড়েছে—তারপর বাড়িতে নিয়ে এলুম—আমার তো জানেন বৌ নেই, ছেলেপিলে নেই—

জীবনরাম বললেন—চাকর সঙ্গে না নিয়ে বেরুনোই অন্যায়।

—আমার তো চাকর রাখবার সামর্থ নেই স্যার। আপনি আছেন, আপনি দেখুন, আপনার কৃপা হলে চাকর দারোয়ান, গাড়ি ঘোড়া সব হবে অনীতার, সব কথা আজ বললাম অনীতাকে।

জীবনরাম প্রীত হলেন। বললেন—বললে নাকি হরিপদ?

—বললাম বৈকি স্যার, সবই বললাম, বললাম অনীতাকে—কুণ্ডুবাবুর আর কে আছে, আপন বলতে তো কেউ নেই। বউ ছেলে মেয়ে সে তো সবারই থাকে, কিন্তু সারা জীবন ব্যবসা নিয়েই মত্ত। অফুরন্ত টাকা দিয়েছেন ভগবান—ভোগ করবার লোক নেই—তা একটু স্নেহ-ভালবাসা, একটু আদরযত্ন—এর জন্যেই কুণ্ডুবাবু আকুল।

জীবনরাম বললেন - তা ঠিকই বলেছো হরিপদ, ছোটবেলায় যেমন দুঃখ-কষ্ট পেয়েছিলাম, বড় হয়ে তেমনি টাকার অভাব হয়নি, দুহাতে টাকা উপায় করেছি.—কোথা দিয়ে কি হচ্ছে বুঝতেই পারিনি—নজর ছিলো কেবল কেমন করে ব্যবসা আরো বড় হবে—সকাল থেকে রাত পর্যন্ত গদির উপর কাটিয়ে রাত্রে বাড়ি গিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়েছি, আবার সকাল হলেই উঠে গদিতে গিয়ে বসেছি, যেন এক ঘুমেই যৌবনটা কাটিয়ে দিয়েছি, এখন ঘুম ভেঙে গিয়ে দেখি এ এক বিচিত্র জগৎ, কখন বয়স হয়ে গিয়েছে টের পাইনি, এখন দেখছি—কিছুই ভোগ করা হোল না, শুধু চিনির বলদের মত টাকা উপায় করেই গেলাম—রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে কত জিনিসই নজরে পড়ে—মনে হয় কিছুই পাইনি। দু-একটা চুল পেকেছে মাথার, কপালে খাঁজ পড়েছে, দাঁত নড়তে শুরু করেছে—তাই হঠাৎ বায়োস্কোপে গিয়ে থিয়েটারে গিয়ে সামলাতে পারি না—মনে হয়—আমার সব গেছে—আমি বাতিল হয়ে গেছি।

হরিপদ বললে—কী আর আপনার বয়স হয়েছে এমন, এখনও দুটো বিয়ে করা চলে ও বয়সে, অনীতা আপনার বয়েসের কথা জিজ্ঞেস করেছিলো সকালবেলা......

—তাই নাকি? তুমি কী বললে হরিপদ? জীবনরাম প্রশ্ন করলেন।

—সত্যি কথাই বললাম স্যার, বললাম—আটত্রিশ পেরিয়ে উনচল্লিশে পড়বেন এবার—তা পুরুষমানুষের আবার বয়েস, পয়সার জোরই আসল জোর, পয়সার জোর থাকলে পঞ্চাশ বছরেও ছোকরার মত শক্তি থাকে।

পঞ্চাশ বছর বয়সের জীবনরাম কুণ্ডুকে চল্লিশ বছর বয়সের যুবকে পরিণত করাতে জীবনরামের মুখটা কেমন আনন্দে বিগলিত হয়েছে তাই দেখতে লাগলো হরিপদ। জীবনরামের কালো মুখের উপর ততোধিক কালো বসন্তের দাগগুলো যেন কুৎসিত ব্যাধির দাগের মত দেখাচ্ছে। হরিপদ নিজের চোখের ক্রুর দৃষ্টিকে মোলায়েম করে জীবনরামকে দেখতে লাগলো।

সরলার শেষ সময়ের কথাগুলো মনে পড়লো হরিপদর। মরবার আগে হরিপদ গিয়েছিলো সরলাকে দেখতে।

সরলা বলেছিলো—ওগো, ওরা আমাকে একমুঠো চাল দেয়নি—আমার ছেলেটা না খেতে পেয়ে মরলো—কত খোসামোদ করেছি, ওদের ভগবান শাস্তি দেবে না!

সেই কথাটা ভাবতে ভাবতে মাথুরামের বেনারসী পানের দোকান থেকে মৃগনাভি দেওয়া খিলি আনালে হরিপদ।

বললে—এই খিলিটা খান, দেখবেন কেমন তাজা বোধ করছেন।

জীবনরাম বললেন—বোতলগুলো শেষ হয়ে গেছে, না আছে কিছু।

—আজ্ঞে আর খাবেন না, নইলে মুখ দিয়ে গন্ধ বেরুবে, মদটা অনীতা পছন্দ করে না কিনা।

গাড়িটা ধর্মতলা স্ট্রীটের পাশ দিয়ে একটা গলির মধ্যে ঢুকলো। বাইরে সবে অন্ধকার হয়েছে। রাস্তায় লোকের ভিড়। চলমান জনতা! জীবনরাম উসখুস করছেন। হরিপদ চেয়ে দেখলে। ওষুধের ফল ধরেছে।

উজ্জ্বল ফর্সা রংএর একটি মেয়ে—চোখে মুখে ঠোঁটে এক অপূর্ব চাঞ্চল্য! দেহের চলাফেরাতে এক অদ্ভুত মাদকতা এনে দেয়—জীবনরাম কল্পনায় অনীতাকে দেখতে লাগলেন। সকালবেলায় একটু আলাপ করে এসেছেন—তারপর রাত আটটায় যাবার কথা! অর্থ—প্রচুর অর্থ নিয়ে জীবনরাম করবেন কি—সব ব্যর্থ, যদি ভোগই না হলো। নির্জীব প্রাণহীন দেহ আর ভোগহীন জীবন—জীবনরামের কাছে যেন দুর্বহ হয়ে উঠেছে। 'জীবনরাম কুণ্ডু এণ্ড কোং'-এর গদিতে বসে যৌবন চলে গেছে অজ্ঞাতে—আজ লুপ্ত যৌবনকে আবার বুঝি ফিরে পেয়েছেন। কান দুটো তার গরম হয়ে এলো—চোখ দুটো জ্বালা করে—সমস্ত শরীরে শিরায় শিরায় আজ লাল রক্ত চলাচল যেন নতুন করে আবার শুরু হয়েছে, জীবনরাম জোরে জোরে পান চিবুতে লাগলেন।

হরিপদর মুখটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

জীবনরাম বললেন—গাড়িটা বড় আস্তে আস্তে চলছে হরিপদ, একটু জোরে চালাতে বলো।

হরিপদ জোরে হাঁকাবার হুকুম দিলো।

দুটো তিনটে গলি পেরিয়ে গাড়ি একটা অন্ধকার সরু গলির সামনে এসে দাঁড়ালো। অন্ধকার হয়েছে চারদিকে। গলির ভেতর গাড়ি ঢোকে না—গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে যেতে হবে ভেতরে।

হরিপদ গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। বললে—আপনি গাড়িতে বসুন স্যার, আমি আগে গিয়ে দেখে আসি।

হরিপদ নেমে গেলো। জীবনরাম দেখলেন, অন্ধকারের ভেতর হরিপদর চেহারা মিলিয়ে গেলো।

তারপর গাড়িতে হেলান দিয়ে একটি সিগ্রেট ধরালেন। অন্ধকারে সিগ্রেটের আগুনটা জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। বাইরে কোন বাড়িতে কারা বুঝি উনুনে আগুন দিয়েছে......ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করছে। উত্তেজনায় জীবনরাম উন্মাদ হয়ে উঠলেন।

কিন্তু হরিপদ আর আসে না। জীবনরাম আর একটা সিগ্রেট ধরালেন। ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা যায় না—কিন্তু জীবনরামের মনে হলো—ধোঁয়ার কুণ্ডলী যেন পাকে পাকে অন্ধকারকে আঁকড়ে ধরছে। সমস্ত গায়ে বিলিতি সেণ্টের গন্ধ—নাকে এসে তীব্র হয়ে লাগে। সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন তাঁর দ্বিগুণ ক্ষমতা নিয়ে আজ সজাগ হয়ে উঠেছে। ইন্দ্রিয়গুলোর অনুভূতি আজ তীব্রতর হয়ে তাকে পীড়ন করতে লাগলো। জীবনরাম সেই অন্ধকার পরিবেশে গাড়িতে বসে বসে প্রতীক্ষার আলস্যে অসহ্য হয়ে উঠলেন। মনে হলো যেন মুহূর্তগুলো ধীর পদক্ষেপে তাঁর কাছে এসে অস্ত্রধারী মুমূর্ষু সৈনিকের মত নিশ্চল হয়ে এলো। সময়ের পাখা যেন অপ্রত্যাশিত ব্যাধের আক্রমণে হঠাৎ থেমে গেছে। যেন হরিপদ আর আসবে না।

কিন্তু হরিপদ খানিক পরেই এল।

বললে—মুশকিল হয়েছে স্যার, ওর এক দূর সম্পর্কের কাকা এসেছে বাড়িতে।

যেন পাহাড়ের চূড়োয় উঠিয়ে কে তাঁকে সেখান থেকে ঠেলে ফেলে দিলে। বললেন—তা হলে দেখা হবে না?

—দেখা হবে না কি মশাই! হরিপদ যখন আছে তখন আপনি কিছু ভাববেন না—

হরিপদ অভয় দিলে।

—কিন্তু একটা অসুবিধে হয়েছে স্যার, কথা বলতে পারবেন না, চুপি চুপি সব সারতে হবে, আর আলোও জ্বালাতে পারবেন না—বলে হরিপদ জীবনরামের মুখের দিকে উৎসুক হয়ে তাকালে।

—তা হোক—অন্ধকারই ভাল, কথা নাই-বা বললাম—জীবনরাম বললেন। জীবনরাম উত্তেজনায় তখন অস্থির হয়ে উঠেছেন।

—তাহলে চলে আসুন, আপনাকে চুপি চুপি অন্ধকারে ঢুকিয়ে দেব, অনীতা ওই ঘরেই আছে—বলে হরিপদ চলতে লাগলো। জীবনরাম পেছন পেছন গেলেন।

অন্ধকার গলি এঁকেবেঁকে গিয়েছে। জীবনরাম হরিপদের ছায়া অনুসরণ করে চললেন। এক জায়গায় এসে হরিপদ বললেন—এই যে দরজা, এই ঘরে ঢুকুন। আলো জালবেন না, তাহলে ওর কাকা টের পাবে—আমি বাইরে আছি......ডাকলেই সাড়া দেব।

জীবনরাম অন্ধকার ঘরে ঢুকতেই কে যেন বাহুবেষ্টন করে তাঁকে আলিঙ্গন করলে......

অনেকক্ষণ পরে ঘর থেকে বেরুবার সময় জীবনরাম একটা সিগ্রেট ধরালেন। দেশলাইএর কাঠিটা জ্বালতেই তার আলোয় হঠাৎ যেন সামনে ভূত দেখে চমকে উঠলেন তিনি। এ কে? কে এ? এতক্ষণ তবে......এ তো অনীতা নয়! মুখখানার সামনে আর একটা কাঠি জ্বাললেন। ভয়ে আঁৎকে উঠলেন জীবনরাম। মুখখানা বিকৃত, নাকের ওপর ফুটো হয়েছে—মাংস গলে পচে ঝুলছে......চুল উঠে গেছে অর্ধেক......কুষ্ঠ, কুষ্ঠব্যাধি! এতক্ষণ কুষ্ঠরোগীর বাহুবেষ্টনে তাঁর সময় কেটেছে তবে! জীবনরামের ঠোঁটে মুখে সমস্ত শরীরে কৃমির মতন যেন কতকগুলো পোকা কিলবিল করতে লাগলো। জীবনরাম নিরুপায় হয়ে আর্তনাদের মত চীৎকার করে ডাকলেন—হরিপদ—হরিপদ—

জীবনরামের কণ্ঠস্বর সেই অপরিসর ঘর আর সংকীর্ণ গলির দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল শুধু......